গভীর জঙ্গলে

শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্য বারো আনা

উপহার

—বক্তব্য—

নিজের জীবনের কতকগুলি ঘটনা নিয়ে এই বইখানি লিখেছি——কল্পনাও আছে।

বাঙ্গালার ছেলেমেয়েদের প্রাণে সাহস এবং শিকারের উৎসাহ জেগে উঠলে আমার শ্রম সার্থক মনে করব।

ইতি—

কলিকাতা
মহালয়া—১৩৪২
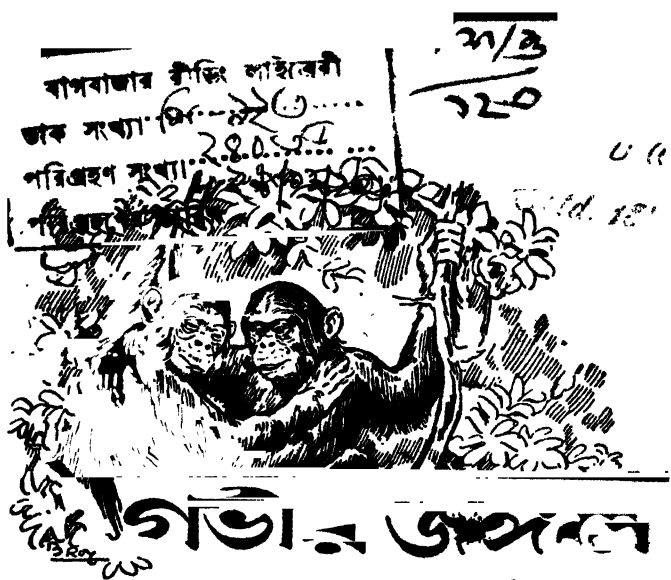
গ্রন্থকার

উৎসর্গ

কুমারী—গৌরীকে

গভীর জঙ্গলে

প্রথম পর্ব

গ্রামে

আমাদের ঝন্টুদা ছিল অসাধারণ ডানপিটে। তার মত দুঃসাহসী, গাঁয়ের আশ-পাশের দশখানা গ্রামের মধ্যে বড় একটা কেউ ছিল না। প্রাণের ভয় যে কি, তা তার আদৌ জানা ছিল না। কোন অসমসাহসিকতার কাজে পশ্চাৎপদ হওয়া তার কোষ্ঠিতে লেখেই নি। বরং যে কাজে যত বেশী বিপদের সম্ভাবনা সেই কাজেই উৎসাহ ছিল তার তত অধিক।

নিজের নানা বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার কাজে ঝন্টুদা আমাদের গ্রামটাকে রীতিমত সরগরম রেখে দিয়েছিলো।

কিন্তু হঠাৎ একদিন সে একটা সাহেবের সঙ্গে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গেল।

সাহেবটি একজন সার্ভেয়ার। ঝণ্টুদার সঙ্গে তাঁর কি রকম করে আলাপ হয়ে যায়। সাহেবও ঝণ্টুদার অসীম সাহসিকতা দেখে তার প্রতি কেমন আকৃষ্ট হ'য়ে পড়েন।

ঝণ্টুদার মা ছিলেন না। তার বাবাও ঝণ্টুর দেশত্যাগের অল্পদিন পূর্ব্বে মারা যান। কাজেই ঝণ্টুর সংসারে কোন বন্ধন ছিল না। সাহেবের অধীনে একটা ভাল চাকরী নিয়ে সে আফ্রিকায় চলে গেল। তার যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রামখানাও যেন ঘুমিয়ে প'ড়লো।

সে আজ প্রায় দশ বৎসর আগেকার কথা। আমরা সকলেই এই দীর্ঘকালের মধ্যে ঝণ্টুদার কথা এক রকম ভুলতেই ব'সেছিলাম। এমন সময় দশ বৎসর পরে হঠাৎ একদিন হ্যাট্‌কোট্‌ প'রে রীতিমত সাহেবী চালে সে গ্রামে ফিরে এল। তার আসবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রামখানাতেও যেন একটা নূতন জীবনের সাড়া প'ড়ে গেল। প্রথম কয়েক দিন তার কাজ হ'লো কেবল নানা লোকের কাছে তার দীর্ঘ প্রবাস জীবনের গল্প করা। আমরা, গ্রামের ছাত্রদল একদিন তাকে ধ'রে বসলাম। ঝণ্টুদার মত শিকারী আর ভীষণ ডানপিটে ছেলে আফ্রিকার মত ভীষণ দেশে গিয়ে কি

আর শান্ত শিষ্ট হ'য়ে ছিল? শিকার সে করেচে নিশ্চয়। বিশেষ যখন সে একজন সাহেবের সঙ্গী হ'য়ে সেখানে গিয়েছিল। আমরা তাকে শিকারের কাহিনী বলতে অনুরোধ করলাম।

আমাদের মধ্যে জনকতক নূতন সহাধ্যায়ী যারা ঝণ্টুদার পূর্ব্বেকার বীরত্ব কাহিনী ও শোনে নি—তারা বল্লে "শুধু আফ্রিকা কেন? আপনি দেশেও যা শিকার ক'রেচেন, সে গল্পও ক'রতে হবে।" অগত্যা সকলের অনুরোধ এড়াতে না পেরে ঝণ্টুদা আরম্ভ করলে :—

"দেখ তোমরা যখন ছাড়বেই না, তখন যথাসম্ভব সংক্ষেপে আমার কথা তোমাদের বলচি। তোমরা অনেকে জানো যে আমি বাল্যকাল হ'তেই খুব বলবান ছিলাম। খেতাম যেমন প্রচুর, শরীর চালনাও করতুম তেম্নি। সব রকম জিম্‌ন্যাষ্টিক আমার আয়ত্ব হ'য়েছিল। তা ছাড়া গাছেওঠা, সাঁতারকাটা, ঘোড়াচড়া, [illegible] সব কাজেই আমার দক্ষতা হ'য়েছিল খুব। বন্দুক ছোঁড়ায় আমি ছিলাম সিদ্ধহস্ত। আমার লক্ষ্য এমন স্থির হয়েছিল যে কোন পাখী ছুটলে বা উড়ে গেলেও আমার হাত হ'তে নিস্তার পেত না। প্রথম প্রথম পাখীর উপর দিয়েই শিকার অভ্যাস করি। তারপর ক্রমে ক্রমে খরগোস, শিয়াল, বনবিড়াল, সজারু, ক্ষ্যাপাকুকুর, ভোঁদড় প্রভৃতি শিকার করতে লাগলুম। তখন আমার বয়স মাত্র চোদ্দ

বৎসর। গ্রামের লোক সবাই বলতেন "ঝণ্টু কালে খুব নামজাদা শিকারী হ'য়ে উঠবে।"

তাঁদের ভবিষ্যৎ বাণী সফল হবার সূত্রপাত হ'লো আমার ষোল বৎসর বয়সেই। তখন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে ঘরে বসে আছি। পরীক্ষার ফল বেরুতে বিলম্ব আছে। কাজেই আর কোন কাজ না পেয়ে শিকারেই মেতে উঠ্‌লাম। প্রত্যহ শিকার। প্রত্যহ নানা স্থানে শিকারের অভিযান। ভোর ৪টার সময় কয়েকজন বন্ধু আর জন দুই চাষাকে সঙ্গে নিয়ে শিকারে রওনা হতাম। আমাদের সঙ্গে প্রাতর্ভোজনের পাঁউরুটী, চিনি তো যেতোই। তা ছাড়া এলুমিনিয়ামের হাঁড়ী, ষ্টোভ, আলু, পেঁয়াজ, মসলা, তেল ইত্যাদি রাঁধবার উপকরণ ও সরঞ্জামগুলিও নেওয়া হ'তো। পথে ঘুঘু, পায়রা, ডাকপাখী, হরিয়াল, ইত্যাদি ছোট জাতের পাখী যা চ'খে পড়তো সেগুলো শিকার [illegible] ক'রতে প্রায় দুই তিন ক্রোশ দূরে একটা না একটা বিলে গিয়ে উপস্থিত হ'তাম। সঙ্গীরা বিলের ধারে একটা বড় গাছের ছায়া দেখে সেখানে আড্ডা গেড়ে ব'সতো। সকলে মিলে প্রথমে বেশ ক'রে জলযোগ সেরে নিতাম। তারপর বন্ধুরা রাঁধবার আয়োজনে মাত্‌তো, আর আমি নেমে যেতাম বিলে। সে বড় সোজা কথা নয়। প্রকাণ্ড বিল, দীর্ঘে ও প্রস্থে

দুই ক্রোশের কম নয়। তার সবটাই হোগলা গাছ, সোলা গাছ, কলমী, দাম ইত্যাদি নানা জঙ্গলে ভরা। মাঝে মাঝে খানিকটা পরিষ্কার স্থান। বিলের জলে নানা বীষাক্ত সাপের বাস। মেচো কুমীরও অনেক। তারই মধ্যে নেমে যেতাম শিকার ক'রতে। দু এক জন চাষা চাকর সঙ্গে যেতো পাখী কুড়োতে। বিলে পাখীও বিস্তর—কায়েম, পাঁপড়া, বালিহাঁস, মাণিকজোড়, কাঁক, গয়াল, পানকৌড়ি, শামুকখোল, এই রকমের কত পাখী। এ সব পাখী দেখলে কি আর সাপের কথা মনে থাকে? না কুমীরের ভয় আসে?

তিন চার ঘণ্টা ধ'রে সারাবিল তোল্‌পাড় ক'রে এই সব পাখী শিকার ক'রতে হ'তো। বিলের জল পরিষ্কার তো নয়ই, তার উপর নানা বনজঙ্গলে ভরা। সহজে এক পা বাড়াবার যোটি নেই। প্রতিপদে ধারাল গাছ আর দাম ঠেলে এগুতে হয়। সারা দেহ ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে যায়। তার উপর মাঝখানের দিকটায় জলও কম নয়। কোথাও কোমর পর্য্যন্ত। আবার কোথাও বা বুক জল। বন্দুকের টোটা রুমালে বেঁধে হরিনামের ঝুলির মত গলায় ঝুলিয়ে, বন্দুক উঁচু ক'রে ধ'রে, ঘুরে বেড়াতে হ'তো।

যাহোক সেই রকম ভূতের মত পরিশ্রম ক'রে এক

বোঝা পাখী নিয়ে প্রায় দুটোর সময় তীরে উঠে আসতুম। ততক্ষণে বন্ধুরা ভাত আর মাংস রেঁধে বসে আছে। সকলে মিলে আনন্দ ক'রে বনভোজন করতাম। সে যে কি আনন্দ তা তোমরা হয়তো বুঝবে না।

ভারী আনন্দে দিন কাট্‌তো। কিন্তু তাতে মাঝে মাঝে বিপদে যে পড়তে হ'তো না তা নয়। একদিন একটা বিলের মধ্যে কণির পাড়ে দাঁড়িয়ে কোথায় পাখী আছে দেখছি, এমন সময় একটা ফোঁস ফোঁস শব্দ কানে গেল। চেয়ে দেখি একটা প্রকাণ্ড কেউটে আমার দশহাত দূরে ফণা তুলে গজরাচ্চে। তার রাঙা চোখ দুটো যেন মণির মত জ্ব'লচে। সর্ব্বনাশ! এখনি তেড়ে এসে একটা ছোবল দিলে আর রক্ষে নেই। তাড়াতাড়ি বন্দুকটা ফিরিয়ে ধরতেই সে আমার মতলব বুঝতে পেরে চকিতে মাথাটা নিচু করে নিয়ে, তীরের মত আমার দিকে ছুটে আসতে লাগলো।

যদি ভয় পেয়ে পালাবার চেষ্টা ক'রতাম তা হ'লে সেদিন সেই বিলের মধ্যেই থেকে যেতাম। কারণ পালাবার স্থানও ছিল না। সময়ের তো কথাই নেই। দু তিন সেকেণ্ডের মধ্যে সে আমার পায়ের কাছে এসে প'ড়লো। আমার মাথায় কে বুদ্ধি দিয়েছিল জানি না—আমিও খুব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে

বন্দুকের নল দিয়ে তার মাজাটা চেপে ধ'রলাম। সে তখন ভীষণ ক্রুদ্ধ হ'য়ে ফোঁস ফোঁস ক'রে গজরাতে গজরাতে বারম্বার সেই নলের উপরেই ছোবল দিতে লাগলো। শেষে আমি বন্দুকের ঘোড়া টিপ্‌তেই তার দেহটা দুইখণ্ড হ'য়ে গেল। তখনও তার কি তেজ! যাহোক সে যাত্রায় খুব রক্ষা পেয়েছিলাম।

আর একদিন শিকার ক'রে বাড়ী ফিরচি। সেদিন বন্ধুরা কেউ সঙ্গে যায়নি, গিছলো কেবল একটা বাগ্দির ছেলে। আমি আপন মনে চ'লচি। বাগ্দির ছেলেটি আমার দশ বার হাত পিছনে আসচে। একটা ঝোপের কাছাকাছি যেই এসেচি আর বাগ্দিটা চেঁচিয়ে ব'ল্লে—"দা-ঠাকুর! শোর, শোর।" চেয়ে দেখি একটা দাঁতালো বুনো শূয়োর তীরের মত আমার দিকে ছুটে আসচে। সর্ব্বনাশ! তখন বন্দুকে টোটা ভরা নেই। দেখলুম একটা গাছের ডাল আমার মাথার দু'হাত উপরে র'য়েচে। তখনি লাফ দিয়ে এক হাতে ডাল ধ'রে পা দুটো উঁচু ক'রলাম। সেই মুহূর্ত্তেই শূয়োরটা একটা কাল ধোঁয়ার তালের মত আমার পায়ের তলা দিয়ে ছুটে গেল।

কথায় বলে শূয়োরের গোঁ। মাথা নিচু ক'রে তীরবেগে যখন তাড়া করে তখন হঠাৎ থামবার শক্তি তার থাকে না। লক্ষ্যচ্যুত হ'লে সে দৌড়ের ঝোঁকে অনেকটা এগিয়ে চ'লে

যায়। হ'লোও তাই। শূয়োরটা আমার পায়ের তলা দিয়ে এক ঝোঁকে বিশ হাত এগিয়ে গেল। সে ফিরে দাঁড়াবার আগেই আমি গাছ হ'তে লাফিয়ে প'ড়ে একটি বুলেট বন্দুকে ভ'রে নিলাম। সে যেমন ফিরে দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ্য করতে যাবে, অমনি গুড়ুম্। একবারে ব্রহ্মতালু ভেদ হ'য়ে শূয়োরটা মাটীতে লুটিয়ে প'ড়লো।

দুমাস পরে ম্যাট্রিকুলেশনের ফল বের হ'লো। দেখলাম আমি প্রথম বিভাগে পাশ করেচি। বাবা ব'ল্লেন "আর শিকারে মেতে পড়ার ক্ষতি ক'রোনা। এইবার মন দিয়ে লেখা পড়া কর।" তিনি আমাকে রিপন কলেজে ভর্ত্তি করে দিলেন।

কলকাতা হ'তে আমাদের গ্রামের রেলষ্টেশন মাত্র পনেরো মাইল। বাড়ী হতেই প্রত্যহ কলেজে যাতায়াত করতাম, আর প্রতি রবিবারে বা ছুটীর দিনে শিকার ক'রতাম।

একদিন দক্ষিণ পাড়ার হরিধন সংবাদ দিলে যে নতুন পুকুরে একটা প্রকাণ্ড কুমীর এসে ভারী উপদ্রব করচে। প্রত্যহ সকালে সে জলের ধারে উঠে রোদ পোহায়। যেমন সংবাদ পাওয়া আর অমনি যাত্রা। পুকুর ধারে গিয়ে দেখি সত্যই কুমীরটা ঘুমুচ্চে। গুড়ি মেরে, ঝোপঝাপের আড়াল দিয়ে যতটা সম্ভব এগিয়ে একশো হাত দূর হতে তাকে গুলি ক'রলাম। গুলিটা বিঁধলো গিয়ে তার কোমরে। কুমীরটাও ছট্‌ফট্‌

ক'রতে ক'রতে জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ডুবে যেতে লাগলো। আমিও ছুটে তার কাছে গিয়ে উপস্থিত। দেখলাম তার সব দেহটা ডুবে গেছে। কেবল লেজের অগ্রভাগটা জলের উপর জেগে রয়েচে। শিকার হাত ছাড়া হবে তা কি সহ্য হয়? টপ্ করে বাঁ হাত দিয়ে তার লেজটা ধ'রে ফেল্লাম। কুমীরটা পালাতে না পেরে আমার দিকে হাঁ করে তেড়ে আসতে লাগলো আর কেবল ফ্যাঁস্ ফ্যাঁস্ করে একটা বিকট গর্জ্জন জুড়ে দিলে।

কুমীরটা জখম হ'য়েছিল খুবই। তার কোমরটা গুলিতে একবারে ভেঙে গিয়েছিল। তাই সে সম্পূর্ণরূপে বেঁকে তার মুখটা আমার কাছে আনতে পারছিলো না। নইলে কি সে আমায় ছাড়তো?

যাহোক প্রায় পনের মিনিট তার সঙ্গে ধ্বস্তাধস্তি করতে হ'লো। পাড়ের উপর তখন প্রায় বিশজন লোক জড় হয়ে হল্লা সুরু করেচে। কিন্তু আমার কাছে এসে আমাকে সাহায্য ক'রতে কারও সাহস হয়নি। শেষে কুমীরটা বেজায় ক্লান্ত হ'য়ে পড়লো। তখন তাকে টানতে টানতে উপরে নিয়ে এলাম। তারপর সকলে মিলে ইট, বাঁশ, লাঠি ইত্যাদির সাহায্যে তাকে মেরে ফেল্লে। কুমীরটা খুব বড় না হ'লেও লম্বায় এগার হাত।

*

* *

আই এ পরীক্ষা দেবার আগে যে রকম বিপদে পড়েছিলাম সে রকল বিপদ হতে বড় একটা কেউ রক্ষা পায় না। উঃ! সে কি ব্যাপার! তখন সকাল ৭টা হবে। আমি বৈঠক-খানা ঘরে ব'সে প'ড়চি। এমন সময় পেঁচো বাগ্দী এসে ব'ল্লে, "দা-ঠাকুর! গাঁয়ে বাঘ এসেচে। কাল রাতে মহেন্দ্র ঘোষের গোয়ালে ঢুকে তিনটে গরু মেরেচে, আর একটাকে নিয়ে গেচে। গোয়ালারা মহা হৈ চৈ বাধিয়েচে।" আমি বল্লাম "বলিস কি? বাঘ? কেউ চ'খে দেখেচে?" পেঁচো ব'ল্লে "দেখবে কি দা-ঠাকুর! দেখলে কি আর রক্ষে ছিলো? তার খাবার দাগ দেখেই সবার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেচে।" আমি হেসে বল্লাম, "আচ্ছা, আচ্ছা, তাকে আর গরু মারতে হবে না। আজই তাকে শেষ করচি। তুই যাবি আমার সঙ্গে?" সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বল্লে—"না দা-ঠাকুর! আমি তা পারবো না। আমি মায়ের এক ছেলে। শেষে কি বাঘের হাতে প্রাণটা দেব?" পাছে বেশী পীড়াপীড়ি করি তাই সে তখনি চলে গেল। আমি ভাবলাম তবে আর দেরী কেন? বেরিয়ে পড়ি। যেই ভাবা, সেই কাজ। লুকিয়ে বন্দুক, টোটা নিয়ে, ভোজালীখানা কোমরে বেঁধে একাই বেরিয়ে

প'ড়লাম বাঘ শিকার করতে। জানোই তো আমি দূরন্ত গোঁয়ার। তার উপর দু-একটা শূয়োর মেরে বুকের পাটা বেড়ে গিয়েচে। ভাবলাম বাঘও মারবো ওই রকম অক্লেশে। সত্য কথা বলতে কি, আমি সেই অপরিচিত আগন্তুক বাঘটাকে একটা ক্ষুদ্রকায় গোবাঘ অর্থাৎ চিতাবাঘ ব'লেই ভেবেছিলাম।

বন্দুক নিয়ে তার খোঁজে চল্লুম। আমাদের গ্রামের পশ্চিম দিকে শুঁটি নদী। তাতে জল কখনো থাকে না। আছে কেবল তার ধারে ধারে খুব ঘন বেতবন। ভাবলাম ওই দিকে গেলেই বাঘের সন্ধান পাব। সেই দিকেই পা চালিয়ে দিলাম।

যাবার পথে গ্রামের শেষভাগে তিনু ঘোষালের পতিত ভিটে। ভিটেটা জঙ্গলে ভরা। একখানি কোঠাঘর অতি কষ্টে দাঁড়িয়ে আছে। তার ছাদের অর্দ্ধেকটা ঘরের মধ্যেই ভেঙে পড়েচে। জানালাগুলোর লোহার গরাদে ঠিক আছে কিন্তু তার কপাটগুলো নেই। দোরটা খুব মজবুত ব'লে এখনো ঠিক আছে। উঠানে জঙ্গল। ঘরের মধ্যেও আগাছা জন্মেচে। মনে ক'রলাম ভিটেটা দেখে যাই।

একটু এগুতেই বাঘের গায়ের গন্ধ নাকে গেল। বুঝলাম বাঘটা এইখানেই কোথাও আড্ডা নিয়েচে। বন্দুক বাগিয়ে ধ'রে নিঃশব্দে ঘরটার কাছে গেলাম। দরজাটি খোলা হা

হা ক'রচে। উঁকি মেরে দেখলাম ওরে বাবা! এ গো-বাঘ নয়—একবারে সাক্ষাৎ ডোরা বাঘ। আমার বুকটা কেঁপে উঠ্‌লো। বাঘটা আরামে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু তবু গুলি ক'রতে সাহস হ'লো না। কি জানি যদি গুলি সাঙ্ঘাতীক না হয়? যদি এক গুলিতে সে কাবু না হয়? তা হ'লে কি আর রক্ষে আছে? মনে ক'রলাম পালাই। কিন্তু তাতেও সাহস হ'লো না। কি জানি যদি পালাতে গিয়ে গাছের পাতা বা কোন জঙ্গল পায়ে লেগে শব্দ হয়? আর তাইতে বাঘটা জেগে ওঠে?

আমি যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। হঠাৎ মাথায় একটা উপস্থিত বুদ্ধি জাগলো। যদি সাবধানে কপাট দুটো টেনে দোরটায় শিকল টেনে দি? তা হলে তো বাঘটাকে বন্দী করা যেতে পারে। সাহসে ভর ক'রে দু-হাত দিয়ে দুটি কপাট ধীরে ধীরে টানলাম। কপাট দুটো ঠিক স'রে এলো, কিন্তু শিকলটা হঠাৎ বেজে উঠ্‌লো। বাঘটা অম্নি জেগে উঠে ড্যাব্‌ ড্যাব্‌ ক'রে আমার দিকে চেয়ে তার ভীষণ দাঁতগুলো বার ক'রে গ'জরে উঠলো। আমার তো প্রাণ খাঁচা ছাড়া। সেই মুহূর্ত্তে কপাট টেনে শিকল এঁটে দিলাম। বাঘটাও বন্দীদশা বুঝতে পেরে একলাফে দরজার উপর এসে পড়লো। তারপর সে ভীষণ গর্জ্জন ক'রতে ক'রতে

লাফিয়ে পাঁচিলের উপর উঠবার চেষ্টা ক'রতে লাগলো।

আমি দেখলাম মুস্কিল। যদি সে পাঁচিলেই ওঠে তা হ'লে সে নিশ্চয় আমার ঘাড়ে এসে প'ড়বে। অগত্যা উপায়ান্তর না দেখে আমি ছুটে একটা পুকুরের কাছে গেলাম। বাঘটা পাঁচিলে উঠ্‌তেই আমি বন্দুকটা তীরে ফেলে রেখে ঝাপিয়ে জলে পড়লাম ও সাঁতরে একবারে মাঝখানে চ'লে গেলাম। বাঘটাও ঠিক সঙ্গে সঙ্গে পুকুর ধারে এসে প'ড়লো। তখন সে একবার জলের ধারে নেমে আসে, আবার উপরে উঠে যায়, আর নিস্ফল আক্রোশে কেবল দাঁত বার ক'রে গজ্‌রাতে থাকে। এক একবার তার গতিবিধি দেখে মনে হয় বুঝি সে জলেই ঝাঁপ দিয়ে প'ড়ে আমাকে আক্রমণ ক'রতে আসবে। কিন্তু কি জন্যে জানিনা সে সেরূপ চেষ্টা করলে না। সে কেবল পুকুরের চারি পাশে ঘুরে বেড়ায় আর এক একবার জলে নামবার উপক্রম করে।

এই রকমে প্রায় বিশ মিনিট কেটে গেল। আমি তো প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়ে প্রাণপণে হাত পা নেড়ে পুকুরের মাঝখানটিতে কোন রকমে দেহটা ভাসিয়ে রাখলাম। কি যে করবো কিছু ভেবে উঠ্‌তে পারলাম না। হঠাৎ দেখলাম বাঘটা খুব অস্থিরতা প্রকাশ ক'রচে। তার যেন আর বিলম্ব

সইচে না। একটা সামান্য মানুষ তাকে ঠকিয়ে এমন ভাবে এতক্ষণ ধ'রে তাকে মুখের গ্রাস হ'তে বঞ্চিত করে রাখবে এটা সে আর সহ্য করতে প্রস্তুত নয়। সে জলের ধারে নেমে সাঁতরে আমার কাছে আসবার সঙ্কল্প ক'রলে। তারপর সত্য সত্যই সে জলে নেমে প'ড়লো আর আমাকে লক্ষ্য ক'রে সাঁতার স্বরু ক'রলে।

আমি দেখলাম সর্ব্বনাশ! আর তো রক্ষা নেই। তখন যথাসাধ্য দ্রুতবেগে সাঁতরে তীরে এসে উঠ্‌লাম। এক দৌড়ে বন্দুকটা কুড়িয়ে নিয়ে যখন পুকুর ধারে এলাম তখন বাঘটা মাঝখান পার হয়ে খানিকটা এগিয়ে এসেচে। তখন আমায় পায় কে? তার ভাসমান মস্তকটি লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুঁড়লাম। বাঘটা যন্ত্রনায় বিকট চিৎকার ক'রে জল তোলপাড় ক'রে তুল্লে। আমি সঙ্গে সঙ্গে আর একবার আওয়াজ করলাম গুড়ুম্।

তারপর লোকজনের সাহায্যে সেই প্রকাণ্ড ব্যাঘ্ররাজকে বাঁশে বেঁধে নিয়ে কোলাহল ও আনন্দে চিৎকার ক'রতে ক'রতে যখন গ্রামের বড় রাস্তায় উপস্থিত হয়েচি, তখন দেখি একজন সাহেব মটরকার চালিয়ে আসচেন। আমাদের শোভাযাত্রা দেখে তিনি গাড়ী থামিয়ে আমাদের কাছে এলেন এবং সেই প্রকাণ্ড বাঘটিকে দেখে মহাবিস্মিত হ'য়ে প'ড়লেন।

বাঘ শিকারের বৃত্তান্তটা সব তাঁকে বল্লাম। তিনি মহাখুসী হয়ে আমার পীঠ চাপড়ে বল্লেন, "বাহবা! সাবাস! তোমার মত সাহসী বালক খুব কমই মেলে।" তারপর তিনি আমার সমস্ত পরিচয় নিয়ে সরকারী ডাক বাঙলোয় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে আমাকে বারম্বার অনুরোধ করলেন।

সেই হ'তে সাহেবের সঙ্গে আমার খুব ভাব হ'য়ে গেল। সাহেবটি নিজে একজন ভাল শিকারী। আমার এই অল্প বয়সে এমন দুঃসাহস আর শিকার-দক্ষতা দেখে তিনি আমাকে খুব ভালবাসতে লাগলেন।

প্রত্যহ সন্ধ্যায় আমি তাঁর বাঙলোয় যেতাম আর দুই তিন ঘণ্টা ধ'রে তাঁর সঙ্গে গল্প ক'রতাম। তিনিও আমাকে নানা জন্তু শিকারের গল্প বলতেন। আমি খাওয়া দাওয়া ভুলে সেই সব গল্প শুনতাম।

একদিন তিনি আমাকে নিয়ে একটা জঙ্গলে বুনো শূয়োর শিকার ক'রতে গেলেন। সাহেবের হাতে রাইফেল আর আমার হাতে ছিল একটা বর্শা। একটা নীচু স্যাঁতসেঁতে জায়গায় এক সঙ্গে চার পাঁচটা শূয়োর কচু গাছের গোড়া খুঁড়ছিল। দূর হ'তে সাহেব একটাকে গুলি ক'রলেন। সেটি তখনি প'ড়ে গেল বটে, কিন্তু আর একটা অতি প্রকাণ্ড শূয়োর একবারে বিদ্যুতের মত বেগে আমাদের

তাড়া ক'রলে। আমাদের মনে হ'তে লাগলো যে একটা ধোঁয়ার তাল বেগে ছুটে আসচে। সাহেব আর লক্ষ্য করবার অবসর পেলেন না। মাত্র তিন চার সেকেণ্ড। তার মধ্যেই জন্তুটা আমাদের কাছে এসে প'ড়লো। সাহেব একটু স'রে দাঁড়াতে গিয়ে একটা গাছের শিকড়ে বেধে প'ড়ে গেলেন। সর্ব্বনাশ! শূয়োরটা তাঁকে দাঁত দিয়ে ফেড়ে ফেলে আর কি। আমি যেন মরিয়া হ'য়ে হাতের বর্ষাটা ছুঁড়ে মারলাম। বর্ষাটি শূয়োরের বুকে বিঁধে একবারে অপর দিকে একহাত বেরিয়ে প'ড়লো। শূয়োরটাও তখনি মুখ থুবড়ে প'ড়লো। সেই সুযোগে সাহেব উঠে গুলি মেরে সেটাকে মেরে ফেল্লেন।

সে যাত্রা আমার দ্বারাই সাহেবের প্রাণ রক্ষা হ'লো মনে ক'রে তিনি আমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রলেন।

এই ঘটনার এক মাস পরে হঠাৎ তিন দিনের জ্বরে বাবা মারা গেলেন। আমি দু-চখে অন্ধকার দেখলাম। মাথার উপর আমার অভিভাবক কেউ র'ইলো না।

বাবার বর্ত্তমানে যেন পাহাড়ের আড়ালে ছিলাম। এখন একবারে পথে ব'সলাম। বাবা রোজগার ক'রতেন খুব। কিন্তু এত অধিক ব্যয় ক'রতেন যে সঞ্চয় কিছু রেখে যেতে পারেন নি। কোনো

রকমে তাঁর শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন ক'রলাম। তারপর কি ক'রবো তাই ব'সে ব'সে ভাবচি এমন সময় সাহেবের আরদালী এসে হাজির। সে ব'ল্লে সাহেব আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। কালবিলম্ব না ক'রে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রলাম। সাহেব আমার সব কথা শুনে খুব দুঃখ প্রকাশ ক'রলেন।

সেই দিনই সাহেবের অধীনে আমার চাকরী ঠিক হ'য়ে গেল। সাহেব নিজে সার্ভেয়ার। সরকারের অধীনে খুব মোটা মাইনে পান। এ দেশের কাজ তাঁর শেষ হয়ে গিয়েচে। এইবার তাঁকে আফ্রিকায় যেতে হবে। এখন তিনি তিন মাসের ছুটিতে আছেন। এই তিন মাস সুন্দর বন অঞ্চলে আর আসামে শিকার ক'রে বেড়াবেন। তারপর তিন মাস বাদে আফ্রিকায় চ'লে যাবেন।

এক সপ্তাহ বাদে তল্পিতল্পা বেঁধে আমরা শিকারের উদ্দেশ্যে সুন্দর বনের দিকে রওনা হলাম।

দ্বিতীয় পর্ব্ব

সুন্দর বনে

হাসনাবাদ থেকে একটা ছোট ষ্টিম্‌লঞ্চে আমরা সুন্দর বনের দিকে যাত্রা ক'রলাম। লঞ্চে সাহেব, আমি, সাহেবের আরদালী, আর আটজন সাহেবের লোক। হাসনাবাদ হ'তে দুজন ওই অঞ্চলের লোককে সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল।

, চওড়া গাঙের উপর দিয়ে তিন চার ঘণ্টা যাবার পর আমাদের ষ্টিম্‌লঞ্চ একটা অল্পপরিসর শাখানদীতে প্রবেশ ক'রল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা সুন্দর বনের কাছাকাছি উপস্থিত হ'লাম। অস্পষ্ট আলোয় দূরে দূরে এক একটি বড় বড় গাছ আর মধ্যে মধ্যে খানিকটা জঙ্গল চ'খে প'ড়তে লাগলো। নদীর দুই ধারে লতাগুল্মের বন আর লম্বা লম্বা খড় ও ঘাসের রাজত্ব। আসল সুন্দর বন সে স্থান হতে আরও ৬।৭ ঘণ্টার পথ। কিন্তু এখন হ'তেই মাঝে মাঝে মেঘ গর্জ্জনের মত দু একটা বাঘের ডাক যা কানে আসতে লাগলো তাইতেই চক্ষু স্থির। সে কি ডাক! সে ডাকে বুকের মধ্যে গুর্ গুর্ ক'রে ওঠে। অতি দুঃসাহসী লোকেরও

প্রাণ কেঁপে ওঠে। বুঝলাম সাক্ষাৎ যমের রাজত্বেই এসে প'ড়েচি।

সে রাত্রে আর বেশী দূর যাওয়া হলো না। মাঝ নদীতে লঞ্চটিকে নোঙর ক'রে আমরা আহারাদির ব্যবস্থা ক'রতে লাগলাম। লঞ্চের দুই ধারে তীরের দিকে দুজন সর্ব্বদাই পাহারা দিতে লাগলো। কি জানি যদি কোন বাঘ মানুষের রক্ত লোভে সাঁতার দিয়েই লঞ্চে এসে ওঠে।

যে নদীতে আমরা লঞ্চটিকে নোঙর ক'রেছিলাম সেটি একটী চওড়া খাল মাত্র। তার বিস্তার বড় জোর দেড়শো হাত। আমাদের লঞ্চের দুই ধারে পঁচাত্তর হাতের বেশী জল ছিল না। মধ্যে মধ্যে দু একটি বৃহৎ আকার বাঘ তীর হ'তে লোলুপ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে হা হা ক'রে ভীষণ আওয়াজ ছাড়ছিল। টর্চ্চের আলো মুখে পড়তেই সপ্রতিভ ভাবে বনের আড়ালে গা ঢাকা দিচ্ছিল।

সেরাত্রে ঘুম আর কারও চ'খে এল না। যেই একটু তন্দ্রা আসে, আর অম্নি সেই মেঘ ডাকার মত ভীষণ আওয়াজ। তন্দ্রা ছুটে বুক গুর্ গুর্ ক'রে ওঠে। অর্দ্ধেক রাত্রে উঠে দেখি একটা প্রকাণ্ড বাঘ তীরে বসে একদৃষ্টে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। সাহেব তার আগুনের ভাটার মত দুটো চোখ লক্ষ্য ক'রে অন্ধকারেই রাইফেল ছুঁড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ

চিৎকার ক'রে বাঘটা প্রায় পনের হাত দূরে জলে এসে পড়লো।

সে রাত্রিটা এম্নিভাবেই কাটলো। ভোরের দিকে সবাই একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। চোখ চেয়ে দেখি বেশ রৌদ্র উঠেচে। বেলা তখন সাতটা। আমরা চা ও জলখাবার খেয়ে বনের ভিতরের দিকে এগুতে লাগলাম। বেলা বারটা নাগাদ সুন্দরবনে প্রবেশ করলাম।

সে কি ভয়ানক স্থান! খালের দুই ধারে সারি সারি প্রকাণ্ড সুন্দরী গাছ। দিন দুপুরেই মনে হয় যেন একটা অন্ধকারের রাজত্বে চলেচি। খালের উপর হ'তে যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল ভীষণ জঙ্গল। মাঝে মাঝে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। তাও আবার নানা গুল্মলতা, আর কেওড়া গাছে ভরা। কথায় বলে ডাঙায় বাঘ জলে কুমীর। এখানে ঠিক তাই। খালের ধারে ধারে কত কুমীর যে দেখলাম। এক একটি যেন প্রকাণ্ড খেজুর গাছ। আমাদের লঞ্চের আশে পাশে খালের জলেও অনেকগুলোকে ভাস্তে দেখলাম।

লঞ্চটিকে নোঙর করবার জন্যে আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্চি এমন সময় একজন কুলি লঞ্চ হ'তে ঝুঁকে প'ড়ে খাল থেকে এক বাল্তি জল তুলতে গেল। আর যায় কোথা? হঠাৎ একটা কুমীরের ল্যাজের ঝাপটায় সে

জলে প'ড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড কুমীর গপ্ করে তাকে ধ'রে ফেল্লে।

শিকার আরম্ভ করার পূর্ব্বেই এমন ভাবে একজন অনুচরকে হারাতে হ'লো দেখে সকলেই অত্যন্ত বিমর্ষ হ'য়ে প'ড়লাম। যা হোক মন দৃঢ় ক'রে নিয়ে আবার আমরা কাজে লেগে গেলাম।

একস্থানে দেখলাম খালের দুপাশ অনেক দূর পর্য্যন্ত ফাঁকা। আমরা সেইখানেই খালের মাঝখানে ষ্টিম্‌লঞ্চটিকে নোঙর করলাম। তারপর তাড়াতাড়ি আহারাদি সেরে নিয়ে সদলবলে ছোট একখানি বোটের সাহায্যে তীরে পদার্পণ করলাম। লঞ্চে কেবল সাহেবের আরদালী আর একজন রসুইকর থাকলো।

তখন বেলা দেড়টা। সাহেব বল্লেন, "আজ আর বেশী দূর যাবার প্রয়োজন নেই। এই ফাঁকার দিকটায় অনেক হরিণ পাওয়া যাবে। আহার সংস্থানের জন্যে তারই দু একটা মেরে নিয়ে ফিরবো।"

দলবল নিয়ে ধীরে ধীরে আমরা অগ্রসর হ'তে লাগলাম। সাহেব ও আমার হাতে দুইটী রাইফেল। সঙ্গের লোকদের কারও হাতে বর্ষা, কারও হাতে টাঙী, কারও হাতে ছোরা, আবার কারও হাতে বা লাঠি। আমাদের দেখে মাথার উপর গাছের ডালে ডালে অসংখ্য বানর

মহা লাফালাফি সুরু করলে। এত বানরও সুন্দর বনে থাকে ? আমরা যথাসম্ভব নিঃশব্দে চ'লচি,—হঠাৎ সাহেব ইঙ্গিত ক'রে বল্লেন, 'চুপ'। আমরা অম্নি দাঁড়িয়ে গেলাম। দূরে একটা প্রকাণ্ড ক্যাওড়া গাছের দিকে আঙুল বাড়িয়ে সাহেব বল্লেন—"ওই গাছে অনেক বানর কিচিমিচি ক'রচে আর গাছের পাতা ভেঙে নীচে ফেলচে। নিশ্চয় ওখানে হরিণের পাল আছে।" দেখলাম সাহেবের কথাই ঠিক। গাছের তলায় আট দশটি হরিণ মনের সুখে ক্যাওড়া পাতা খাচ্চে। ঝোপের আড়ালে কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে সাহেব ও আমি এক সঙ্গে রাইফেল তুল্লাম। সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ হতেই দুইটি বৃহদাকার হরিণ মাটিতে লুটিয়ে প'ড়লো।

প্রথম উদ্যমেই কৃতকার্য্য হয়েচি বলে মনে খুব আনন্দ হ'লো। কুলিদের সঙ্গে নিয়ে শিকার দুটো কুড়িয়ে আনতে গেলাম। হরিণ দুটির কাছ বরাবর গিয়েছি এমন সময় ভয়ানক গর্জ্জন ক'রে একটা বাঘ আমাদের দলের মধ্যে লাফিয়ে প'ড়লো। চক্ষের নিমেষে সে একটা হতভাগ্য কুলিকে মুখে নিয়ে ঝড়ের মত কোথায় যেন মিশিয়ে গেল।

আমরা সকলেই ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। সেই হতভাগ্যকে অন্বেষণ করা বৃথা জেনে আর কোন চেষ্টা ক'রলাম না। হরিণ দুটোকে নিয়েই লঞ্চে ফিরে এলাম।

হরিণের মাংস আর বাসি পাঁউরুটী খেয়ে সে রাতটা লঞ্চেই কাটিয়ে দিলাম।

প্রত্যুষে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের একখানি প্রকাণ্ড বোট এসে হাজির। বোট্‌খানিতে দুজন লাল মুখ আর অনেকগুলি দেশীয় কুলী দেখলাম। সাহেব দুটী আমাদের লঞ্চ দেখে বিস্মিত হ'য়ে তদারক করতে এলেন, তারপর আমাদের সাহেবের পরিচয় আর শিকারের পাশ দেখে তাঁর সঙ্গে ভাব ক'রে ফেল্লেন।

সাহেব তিনজন এক সঙ্গে ব্রেকফাষ্ট করতে বসে শিকারে যাবার যুক্তি আঁটলেন।

বেলা নয়টার পূর্ব্বেই দুই দলের লোকজন সব একত্র হ'য়ে মস্ত বড় একটা দল বেঁধে শিকার করবার জন্যে গভীর বনের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

কি গভীর বন! ঘন সন্নিবিষ্ট প্রকাণ্ড সুন্দরী গাছের শ্রেণী শাখায় শাখায় জড়াজড়ি ক'রে পরস্পর পরস্পরকে যেন আলিঙ্গন ক'রচে। তার উপর নানা জাতীয় লতা, গাছের শাখাগুলিকে এমন ভাবে ঘিরে রেখেচে যে দিন দুপুরেও সেখানে সূর্য্যের রশ্মি ঢুকতে পারে না। কোথাও বা কেওড়া, বাবলা, সাঁই ও আরও কত গাছ একসঙ্গে যেন তাল পাকিয়ে র'য়েচে। বনের ভিতরটা ভয়ানক গম্ভীর—

ঢুকলেই যেন গা ছম্ ছম্ করে। আমরা দলে ভারী হ'লেও ভয়ে ভয়ে, সন্তর্পণে, এগিয়ে যেতে লাগলাম।

হঠাৎ আমাদের দক্ষিণ পাশের জঙ্গল থেকে একটা বাঘ গর্জ্জন ক'রে আমাদের সুমুখে লাফিয়ে প'ড়লো। আমরা তাড়াতাড়ি বন্দুক তোলবার আগেই সে আর একটা প্রকাণ্ড লাফ দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে প'ড়লো।

তাকে অনুসরণ না ক'রে আমরা বাঁ দিকে চ'লতে লাগলাম,—কারণ বাঁ দিকের জঙ্গলটা কিছু পাত্‌লা। সেই দিকেই শিকারের সুবিধা। কিছু দূর যেতে না যেতেই আমাদের সাহেব হঠাৎ দাঁড়িয়ে প'ড়ে তাঁর রাইফেল তুলে ধ'রলেন। সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ হ'লো গুড়ুম। চেয়ে দেখি দূরে ক্যাওড়া গাছের তলায় একটা বাঘ মাটীতে প'ড়ে ছট্‌ফট্ ক'রচে। গুলি একবারে তার মাথায় বিঁধেচে ব'লে বাঘ ভায়া উঠে দাঁড়িয়ে আর জারীজুরী ক'রতে পারচেন না।

বাঘের জাত, বিশ্বাস নেই। আর একটু এগিয়ে গিয়ে সাহেব তাকে আর একটা গুলি ক'রতেই সে একবারে স্থির।

বাঘটাকে দড়ির সাহায্যে একটা কেওড়া গাছের উঁচু ডালে ঝুলিয়ে রেখে আমরা আবার সুমুখ দিকে এগিয়ে চ'ল্লাম। একটুখানি যেতে না যেতেই ফেউএর ডাক কানে এল। বুঝলাম নিকটেই বাঘ আছে। আমরা খুব সাবধান হ'য়ে চ'লতে

লাগলাম। যে ঘন জঙ্গল, তাড়াতাড়ি যাবার কি উপায় আছে ?

আমাদের একটু আগে দুতিনটে স্থন্দরী গাছ জড়াজড়ি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। তার ওধারে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। স্থন্দরী গাছ তিনটার গোড়ায় পেঁ ৗছেই দেখতে পেলাম একটা প্রকাণ্ড বাঘ আর একটা বাঘিণী এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে।

বাঘটা গর্জ্জন করতে করতে মাটী আঁচড়াতে স্থরু ক'রলে আর বাঘিণী দাঁত মুখ খিঁচিয়ে গোঙরাতে লাগলো। আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখান হ'তে তাদের গুলি করার স্থবিধা হ'লো না। কারণ তারা দুটোই আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের দূরত্ব আমাদের কাছ হতে প্রায় চারশো হাতের উপর। এত দূর হ'তে কেবল মাথাটি লক্ষ্য ক'রে গুলি ক'রলে হয়তো লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'তে পারে। তাই আর একটু এগিয়ে যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত ব'লে সবাই মনে ক'রলেন।

পরামর্শ মত আমার সাহেব আর আমি বাঘিণীর দিকে লক্ষ্য রাখলাম। ফরেষ্টার সাহেবেরা বাঘটাকে হত্যা ক'রবেন বল্লেন। যা হোক আমরা চারজন দুই দলভুক্ত হ'য়ে কুলীদের নিয়ে একটু একটু ক'রে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

আমাদের দেখে বাঘিণীটা একলাফে বনের ভিতর ঢুকে প'ড়ল। তাকে শিকার করা আমাদের ভাগ্যে হ'লো না।

বাঘিণীটার সন্ধানে সুমুখের ও আশপাশের ঝোপ- ঝাপ তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজতে খুঁজতে চ'লেচি। সবাই মনে ক'রলে সেটা ভয় পেয়ে সে অঞ্চল ছেড়ে পালিয়েচে।

অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'য়ে চলতে লাগলাম। সুন্দর বনের ব্যাপার তো আমি জানি না। অন্যমনস্ক হ'য়ে চলছি এমন সময় হঠাৎ নিকটবর্ত্তী একটা ঘাসের ঝোপ থেকে বাঘিণীটা আমার ঘাড়ে পড়ে কামড়ে ধ'রে চক্ষের নিমিষে আমাকে শূন্যে উড়িয়ে নিয়ে চ'ল্লো।

আমার গায় একটা মোটা গরম কোট, আর তার উপর একটা ওভার কোট ছিল। সেই দুইটী জামায় কামড় দিয়ে সে আমাকে টেনে নিয়ে চ'ল্লো।

বাঘের হাতে পড়া যে কি রকম ব্যাপার তা যে প'ড়েচে সেই জানে। আমার অদম্য সাহস, বল, সব যেন কোথায় উড়ে গেল।

ভয়ে আমার হাত হ'তে রাইফেলটিও কোথায় প'ড়ে গেল।

আমি বিড়ালের মুখে ছোট ইঁদুর ছানাটির মত নিস্পন্দ অসাড় হ'য়ে ঝুলতে ঝুলতে বহুদূর চল্লাম।

অল্পক্ষণ পরে বাঘিনীটা একটা ফাঁকা জায়গায় আমাকে নামালে। সেখানে চারিধারে বিশ পঁচিশ হাতের মধ্যে গাছ একটাও নেই। কেবল স্থানে স্থানে এক রকম লম্বা ঘাসের ঝোপ।

আমাকে মাটীতে ফেলে বাঘিনীটা একবার চারিধারে দৃষ্টিপাত ক'রে নিলে। তারপর সে আমার দিকে ফিরলে। বুঝলাম এইবার সে হয় একটি থাবায় আমার ঘাড়টি ভেঙে ফেলবে. না হয় এক কামড়ে আমার টুটি ছিঁড়ে রক্ত চুষে খাবে।

বাঘিনীটা কিন্তু তখনি আমাকে আক্রমণ ক'রলে না। সে একবার এপাশে একবার ওপাশে লাফালাফি ক'রে যেন আমাকে নিয়ে খেলা ক'রতে লাগলো। বাঘিনীর খেলা দেখে, প্রতিক্ষণে তার নিষ্ঠুর আক্রমনের প্রতীক্ষা করচি, এমন সময় এক অদ্ভূত ব্যাপার ঘটে গেল।

আমার পাশেই একটা ঘাসের ঝোপ ছিল। তার ভিতর হ'তে একটা প্রকাণ্ড সাপ ফোঁস ক'রে একবারে মানুষ সমান ফণা তুলে দাঁড়ালো আর সঙ্গে সঙ্গে বাঘিনীটার মাথায় ছোবল বসিয়ে দিলে। বাঘিনীটাও সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ আর্ত্তনাদ ক'রে মাটীতে লুটিয়ে প'ড়লো। সাপটি আমাকে কিছু না ব'লে ঘাসের ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেল।

আমি আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করলাম না, দাঁড়িয়ে উঠে এক দিকে ছুট্‌লাম।

কিছুদূর ছোট্‌বার পর আমি আমার ভুল বুঝে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তাইতো! কোনদিকে যাব? আমার দলবল কোন দিকে আছে তা জানিনা। তাদের কাছ হ'তে কতদূরে এসেচি তাও আমার জানা নেই। এমন লক্ষ্যশূন্য ভাবে এই সাক্ষাৎ যমের রাজত্বে এক পা যেতে না যেতে আবার হয়তো বাঘের হাতে পড়তে পারি। হাতে রাইফেল নেই, সঙ্গে কোন অস্ত্র নেই যে তাই দিয়ে আত্মরক্ষা ক'রবো। তবে?

এক পা আর এগুতেও সাহস হ'লো না। নিকটেই একটা প্রকাণ্ড পাকুড় গাছ ছিল। আমি তাড়াতাড়ি সেই গাছে উঠে প'ড়লাম।

মাত্র হাত-দশেক উপরে উঠেছি এমন সময় দেখি একটা বাঘ সেই গাছের তলায় এসে হাজির। সে আমাকে দেখে মহা তম্বি করতে লাগলো। আমি আরও উঁচুতে উঠে, দুইটি মোটা ডালের মাঝখানে ব'সে, ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে রইলাম।

এমনি ক'রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে লাগলো। নীচে বাঘ আর উপরে আমি।

নামবার উপায় নেই। পরিত্রাণের আশা নেই। বাঘটা একবার এদিক, একবার ওদিক ক'রে ঘুরে বেড়ায় আর মাঝে

মাঝে নিতান্ত অসহিষ্ণুর মত গাছে ওঠবার জন্যে গাছের গুঁড়ি আঁচড়াতে থাকে।

ক্রমে সন্ধ্যা এসে গেল। কাকপক্ষের মত মিশ্ কালো অন্ধকার আমার চারিদিকে জমাট হ'য়ে এল। যেদিকে চাই গাঢ় অন্ধকার। কেবল মাথার উপর নীল আকাশের গায় অসংখ্য নক্ষত্র মিট্‌মিট্ ক'রে জ্বলছে।

তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। সারা দেহ ঝিম্ ঝিম্ ক'রে গাছ হ'তে প'ড়ে যাবার মত অবস্থা হ'লো। উপায়ান্তর না দেখে, ওভার কোট্‌টা খুলে গাছের ডালের সঙ্গে নিজেকে বেশ ক'রে বাঁধলুম।

বাঘটার কি ধৈর্য্য! কি অসীম অধ্যবসায়! সে সারারাত আমার পিছনেই লেগে রইলো। মাঝে মাঝে নীচের দিকে চাই আর তার আগুনের আঙ্‌রার মত জ্বল্‌জ্বলে চোখ দুটো দেখে প্রাণ শিউরে ওঠে।

ক্ষিদে তৃষ্ণার জ্বালা এত বাড়লো যে, ভাবলুম বুকের ভিতরটা বুঝি ফেটে চৌচির হ'য়ে যায়। মনে হ'লো নিজের দেহ কামড়ে নিজের রক্ত চুষে খাই। উঃ! সে যে কি যন্ত্রণা!

শেষ রাত্রে হঠাৎ গাঢ় মেঘে আকাশ ছেয়ে ফেল্লে। সঙ্গে সঙ্গে কি ঝড়! এক একটা দম্‌কা হাওয়া আসে

আর গাছের ডাল হ'তে আমাকে যেন ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায়।

ঝড়ের সঙ্গে মুষল ধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হ'লো। আমার সারা দেহ ভিজে চ্যাব-চেবে হ'য়ে গেল।

একে শীতকাল। তার উপর এই বৃষ্টি। আমার শরীর দারুণ শীতে থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে লাগলো। মনে হ'লো বুঝি কাঁপুনির চোটে হার্টফেল হ'য়েই যায়।

ঘণ্টাখানেক পরে ঝড়বৃষ্টি থেমে আকাশ পরিষ্কার হ'য়ে গেল। পূবের আকাশ যেন ফর্শা হ'য়ে এল। তখনো আমার কাঁপুনি যায় নি। অনেক কষ্টে এক এক করে গায়ের জামাগুলো খুলে ফেল্লুম। তারপর সেই জামা নিংড়ে জল খেয়ে দারুণ তৃষ্ণার জ্বালা কমিয়ে নিলুম। শরীরটাও একটু সুস্থ হ'লো।

সকাল হ'য়ে গেল। আকাশে সূর্য্যোদয় হ'লো। একটু একটু সূর্য্যকিরণ আমার গায়ে এসে পড়তে শীতটা প্রায় চোদ্দ আনা কমে এলো।

ঝড় বৃষ্টির সময় বাঘটা বোধ হয় স'রে প'ড়েছিলো। কারণ বহুক্ষণ তার কোন আওয়াজ পাইনি। কিন্তু সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সে এসে হাজির।

বুঝলাম রক্ষা আর নেই। হয় এর পেটেই যেতে হবে,

না হয় এই গাছের ডালে ব'সে ব'সে ম'রতে হবে। তারপর শকুনির পাল এসে আমার মৃতদেহ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে।

এমনি ক'রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে লাগলো।

আবার সন্ধ্যে এল। জমাট কালো অন্ধকারে পৃথিবী ছেয়ে গেল। রাত্রি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিদে ও তৃষ্ণায় মরার মত হ'য়ে আমি সেই গাছের ডাল আঁকড়ে বসে রইলাম। বাঘটার দাপাদাপি পূর্ব্ব রাত্রের মতই চ'লতে লাগলো।

তারপর যখন সকাল হ'লো তখন আর আমি সহ্য ক'রতে পারলাম না। ভাবলাম এ রকম তিলে তিলে মরার চেয়ে বাঘের হাতে মরাই শ্রেয়। এক নিমিষে প্রাণটা বেরিয়ে যাবে, সে আর কতক্ষণের কষ্ট? ম'রতেই যখন হবে, মরা ছাড়া যখন আর উপায় নেই, তখন এ রকম ক'রে মরার চেয়ে সে মরণ শতগুণে শ্রেয়।

ভাবতে ভাবতে ওভার কোটের বাঁধনটা খুলচি এমন সময় হঠাৎ পূবদিকে রাইফেলের আওয়াজ শুনতে পেলাম। আওয়াজটা ক্ষীণ। বোধ হয় অন্ততঃ আধ মাইল দূরে কেউ বন্দুক ছুঁড়ে থাকবে।

প্রাণে একটা ভরসা এল। তবে তো আমার সাহেব এখনও সুন্দরবনে আছেন। এখনও তিনি শিকার করে বেড়াচ্চেন। হয় তো তিনি দলবল নিয়ে এইদিকে এসে

প'ড়তেও পারেন। এই কথা ভাবতেই আমার প্রাণে একটা নতুন আশা দেখা দিলে। মনে হ'লো আবার আমি বাঁচবো। আবার আমার দলে গিয়ে মিশতে পারবো।

কিন্তু ক্ষিদের জ্বালা, আর কোন প্রবোধই মানতে চাইছিল না। এখনই যা হয় কিছু খেতে হবে। কিন্তু কোথায় কি পাই?

দেখলাম পাকুড় গাছটিতে অনেক পাকা পাকা পাকুড় ফল ঝুলচে—পাকুড় ফল বিষাক্ত নয় নিশ্চয়। কারণ পাখীরা তা আনন্দের সঙ্গে খেয়ে থাকে। আমি আর ধৈর্য্য ধরতে পারলাম না। নিজেকে বন্ধন মুক্ত ক'রে ধীরে ধীরে উঠে পাকুড় ফল পেড়ে খেতে লাগলাম।

পুরো দুদিনের উপর গাছটিতে বাসা নিয়েচি। কিন্তু তার সব দিকটায় লক্ষ্য করবার অবসর পাই নি। কেবল বাঘের দিকে চেয়ে চেয়েই সময় কাটিয়েচি। আজ পাকা পাকা পাকুড় ফলের লোভে গাছের সব দিকটায় চোখ ফেলতে তার একধারে দুই তিনটি ডালের উপর একটা মাচা দেখতে পেলাম।

কিসের এ মাচা? তবে কি কিছুদিন আগে এখানে মানুষের সমাগম হ'য়েছিল? কৌতুহল পরবশ হ'য়ে গাছের সেই দিকটায় গেলাম। বাঘের ভয় তখন বিশেষ নেই। তার সঙ্গে দুরাত বাস করে তাদের দৌড় অনেকটা বুঝে

নিয়েচি। যতক্ষণ আমি গাছের উপর, ততক্ষণ তাদের ভয় আমার নেই। সাবধানে ডাল ধ'রে ধ'রে মাচার কাছে হাজির হলাম।

মাচার দিকে চাইতেই আমার প্রাণ যেন আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। এ কি আশ্চর্য্য! মাচার উপর একটা রাইফেল আর তার পাশে একটা ছোট চামড়ার বাক্স। নিশ্চয় এটাতে টোটা আছে। তাড়াতাড়ি মাচায় উঠে রাইফেলটা হাতে তুলে নিলাম। দেখলাম তাতে টোটা ভরা আছে। চামড়ার বাক্সটি খুলে দেখলাম তাতে একটী ছোট টর্চ্চ লাইট আর অনেকগুলি টোটা র'য়েচে। মহা আনন্দে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

তোমরা হয়তো ভাববে যে বাহাদুরী নেবার জন্যে তোমাদের কাছে একটা গাঁজাখুরী গল্প বানিয়ে ব'লচি। কিন্তু এটা নিছক সত্য কথা।

তোমাদের মত আমারও মনে প্রশ্ন উঠেছিল যে তেমন সময়ে সেই স্থানে একটা মাচার অস্তিত্ব কেমন ক'রে এল, আর তার উপর টোটা আর রাইফেল কেমন ক'রে পাওয়া সম্ভব হ'লো। প্রথমে আমিও ভেবে কিছু ঠিক ক'রতে পারিনি। মনে হ'লো যে অসম্ভবই বা কিসে? নিশ্চয় কোন শিকারী পায়ে হেঁটে বাঘ মারা নিরাপদ নয় জেনে, গাছের উপর ওই মাচা বেঁধে নিয়েছিল। তারপর রাইফেল আর টোটা নিয়ে ওই মাচার

উপরে সে বাঘের প্রতীক্ষায় ব'সেছিল। হয়তো বা বাঘগুলিকে তার বন্দুকের পাল্লার মধ্যে নিয়ে আসবার উদ্দেশ্যে সে নীচে কোথাও একটা ছাগল বেঁধে রেখে দিয়েছিল। না হয় সে কোন কারণে নীচে নামতেই হঠাৎ কোন বাঘ তাকে আমার মত ক'রে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। এই রাইফেল আর টোটা সেই হতভাগ্যের।

যা হোক রাইফেলটা পেয়ে মনে ভারী উৎসাহ এসে গেল। আর আমাকে মারে কে? এইবার বাঘের দফা শেষ ক'রে তবে আমার কাজ।

রাইফেলটা তুলে নিয়ে তাতে টোটা ভ'রলুম। তারপর বেশ ক'রে বাঘটার মাথা লক্ষ্য ক'রে গুলি ক'রলুম। বাঘটা এক গুলিতেই ম'রে গেল।

আমি আর বিলম্ব ক'রতে পারলাম না। কিছুক্ষণ আগে পূর্বদিকে রাইফেলের আওয়াজ শুনেচি। আমার দলবল সেই দিকে আধ মাইলের মধ্যে আছে নিশ্চয়।

এ সুযোগ কি হারাতে আছে? তাড়াতাড়ি জামাজোড়া গায়ে দিয়ে, রাইফেলে টোটা ভ'রে নিয়ে গাছ হ'তে নেমে প'ড়লাম। চামড়ার ছোট বাক্সটি কোমরে বেশ ক'রে বেঁধে পূর্ব্বদিক লক্ষ্য ক'রে ছুটলাম।

আমি তখন মরিয়া। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'য়েছি যে

আমার মৃত্যু নেই! তেমন অবস্থার মধ্যে প'ড়েও যে বেঁচে উঠ্‌তে পারে, তার মৃত্যুর বিলম্ব আছে নিশ্চয়। অন্ততঃ সেদিন আমার মৃত্যু কিছুতেই নেই।

বন-বাদাড় ভেঙে ছুটছি হঠাৎ নিকটেই বাঘের গর্জ্জানি শোনা গেল। রাইফেলটা বাগিয়ে ধ'রে একটা বড় গাছের ওপাশে দৃষ্টি ফেলতেই দেখলাম, সর্ব্বনাশ! একজন সাহেব মাটীতে চিৎ হ'য়ে প'ড়ে একটা বাঘের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করচেন। বাঘটা সাহেবের বুকের উপর চেপে ব'সেচে বটে কিন্তু কিছুতেই তাঁকে কাবু ক'রতে পারচে না। সাহেবটি দুই হাত দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে বাঘের টুঁটি চেপে ধ'রে তার মুখখানাকে নিজের দেহ হ'তে তফাতে রেখে দিয়েচেন আর সঙ্গে সঙ্গে দুই পায়ের বুটজুতো দিয়ে বাঘের পেটে গুঁতো মারচেন।

বুঝলাম এ ভাবে বাঘের সঙ্গে সাহেব বেশীক্ষণ লড়তে পারবেন না। শীঘ্রই বাঘের হাতে তাঁকে প্রাণ দিতে হবে। ভাল ক'রে দেখলাম সাহেবটি অন্য কেউ নন্। আমাদের ফরেষ্টার দ্বয়ের একজন।

এখনি গুলি করার প্রয়োজন। নইলে সাহেবকে জীবন্ত ফিরে পাওয়া যাবে না। কিন্তু সে রকম অবস্থায় গুলি করা বিপজ্জনক। গুলি বাঘের পরিবর্ত্তে সাহেবের গায়েও বিঁধতে পারে। কিম্বা গুলি লাগার সঙ্গে

সঙ্গে বাঘটা এক শেষ থাবায় সাহেবের দেহটাকে মাংসের তাল বানিয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু যাই হোক, দেরী আর করা চলে না। আমি রাইফেলটা বাঘের দিকে ফিরিয়ে ধ'রে প্রাণপণে চিৎকার করলাম। আমার চিৎকার শুনে বাঘটা আমার দিকে ফিরে চাইতেই তার কর্ণমূল লক্ষ্য করে গুলি করলাম। একেবারে অব্যর্থ সন্ধান। বাঘটা কাঠপানা হ'য়ে সাহেবের পাশে ঢ'লে প'ড়লো।

ছুটে গিয়ে দেখলাম সাহেব খুবই আহত হ'য়েছেন। তাঁর আর ওঠবার সামর্থ নেই। আমি তাঁকে ধ'রে দাঁড় করাবার চেষ্টা করচি, এমন সময় আমাদের দলবল সেখানে এসে হাজির। আমাকে দেখে তাঁরা সকলে যেন আকাশ থেকে পড়লেন। আমি সত্যই আমি, কি আমার প্রেতাত্মা এই সন্দেহই যেন তাঁদের চখের দৃষ্টিতে প্রকাশ পেতে লাগলো। তারপর যখন তাঁরা ভাবলেন যে আমিই সাহেবের রক্ষাকর্ত্তা তখন তাঁরা মহা সমাদরে আমাকে সেকহ্যাণ্ড ক'রলেন।

তারপর আহত সাহেবকে তুলে আর বাঘটাকে বাঁশে বেঁধে নিয়ে আমরা নিজেদের বোটে ফিরে এলাম।

আমার গত দুই দিনের সব বৃত্তান্ত শুনে সকলেই খুব আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন। এমন দশায় খুব কম লোকেই পড়ে।

পরদিন ভোরেই ফরেষ্টারদের বোট ক'ল্কাতায় যাত্রা

ক'রলে। সাহেবের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁর রীতিমত চিকিৎসার প্রয়োজন। আমাদেরও সুন্দরবনের শিকার শেষ হ'য়ে গেল। সেইদিনই আমরা হাসনাবাদে ফিরে এলাম। পাঁচদিন বসিরহাটের ডাক বাঙলোয় বিশ্রাম ক'রে, আসামের দিকে রওনা হলাম।

তৃতীয় পর্ব্ব

আসামে

শিয়ালদা হ'তে রেলে যাত্রা ক'রে প্রত্যুষেই আমরা গোয়ালন্দ ঘাটে পৌঁছুলাম। তারপর ষ্টিমার।

পদ্মার বুক চিরে আমাদের ষ্টিমার চাঁদপুরের দিকে চ'ল্লো। কি ভীষণ চওড়া এই পদ্মা নদী। চারিধারেই সমান। ষ্টিমার হ'তে বহুদূরের তীর ধোঁয়ার মত বোধ হ'তে লাগলো।

বেলা এগারটার পর আমরা চাঁদপুরে পৌঁছুলাম। আসাম বেঙ্গল রেলের উপর চাঁদপুর ষ্টেশন। আমরা যাবার পনের মিনিট পরেই চাটগাঁর দিক হতে ট্রেণ এল। সেই ট্রেণে আমরা আসামের দিকে রওনা হলাম। সে দিন ও রাত 'ট্রেণেই থাকতে হ'লো। পরদিন একটা ষ্টেশনে গাড়ী বদ্‌লে বেলা ১ টার সময় আমরা শিলচরে পৌঁছুলাম।

শিলচর কাছাড়ের সেরা নগর। সেটি ফরেষ্ট বিভাগের হেড্ কোয়াটার। সেখানকার ফরেষ্টার সাহেব আমার সাহেবের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমরা সদলবলে তাঁর বাঙলোয় গিয়ে উঠলাম।

সেখানে প্রায় কুড়িদিন আমাদের বিশ্রাম ক'রতে কেটে গেল। সাহেব তাঁর বন্ধুর বাঙলোতেই থাকলেন। আমরা রইলাম একটা তাঁবুতে।

সুন্দরবনের মত আসামের জঙ্গলে পায়ে হেঁটে শিকার করা বড় সুবিধাজনক নয়। আসামের জঙ্গল খুব গভীর আর সেখানকার ভূমি মোটেই সমতল নয়।

আসামের জঙ্গলে বিস্তর বুনো হাতী আছে। সেই জন্যে হাতীর পীঠে চ'ড়ে সেখানে শিকার করার রীতি। এই অঞ্চলে অনেক জমীদারের পোষা হাতী আছে। কিন্তু সেগুলো প্রায়ই ছাড়া থাকে আর ইচ্ছামত দূরে দূরে খেয়ে বেড়ায়। প্রয়োজন হ'লে, খোঁজ খোঁজ প'ড়ে যায়। মাহুতেরা কয়েক দিন খোঁজার পর তবে তাদের ধ'রে আনতে পারে।

শিলচরের ফরেষ্টার সাহেব দুজন জমীদারকে হাতী পাঠাবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু খোঁজ ক'রে হাতী ধ'রে এনে পাঠাতে তাঁরা বিলম্ব ক'রে ফেল্লেন। কাজেই আমাদেরও শিকার যাত্রার বিলম্ব হ'য়ে গেল।

কয়েকদিন বাদে একসঙ্গে চারটি হাতী এসে হাজির। পরের দিনই রীতিমত বন্দুক, সাজ সরঞ্জাম আর লোকজন নিয়ে আমরা উত্তর দিকে হিমালয়ের অভিমুখে যাত্রা করলাম।

গভীর জঙ্গলে

চারিটি হাতীর একটীতে আমার সাহেব, একটিতে তাঁর ফরেষ্টার বন্ধু, আর একটিতে আমি। চতুর্থ হাতীর পীঠে কয়েক দিনের উপযোগী সকলের আহার্য্য ও নানা সাজসরঞ্জাম বোঝাই দেওয়া হ'ল। আমরা চল্‌লাম হাতীর পীঠে, আর আমাদের লোকজন চ'ল্লো পয়দলে।

একটি পুরো দিন পথেই কেটে গেল। সে কি সোজা পথ? পথের যেন আর শেষ নেই। সারাদিন পরে সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে একটা হাঁতী- ধরা খেদায় গিয়ে আমরা সে রাতের মত আশ্রয় নিলাম।

পরের দিন ভোরে আবার যাত্রা সুরু হ'লো। বেলা নয়টার সময় একটা গভীর জঙ্গলে ঢোকা গেল।

কি ভয়ানক জঙ্গল! যেমন বহুকালের পুরোণো প্রকাণ্ড গাছ, তেমনি আবার ঘন লতাগুল্ম।

জঙ্গলে নানা রকমের গাছ। তার মধ্যে শাল আর সেগুনের সংখ্যাই বেশী।

সে দিন শিকার আরম্ভ না ক'রে লোকজনের সাহায্যে বড় বড় গাছের উপর আমাদের আশ্রয়ের জন্যে মাচা বেঁধে নেওয়া হ'লো।

মাচা বাঁধবার মুখেই এক মহা বিপদ। চারজন কুলী একটা গাছের উঁচু ডালে মাচা বাঁধচে। গাছের উপর ঠকাঠক

শব্দ হচ্চে। এমন সময় দুটো প্রকাণ্ড ভাল্লুক বন থেকে বেরিয়ে সেই দিকে ছুটে এল। সুমুখে অনেক লোকজন আর হাতী দেখে তারা তর্‌তর্‌ ক'রে সেই গাছটিতে উঠে দুজন কুলীকে জড়িয়ে ধ'রে তাদের টুঁটি কামড়ে ধ'রলে। অপর দুজন গাছের ডালে ব'সে থর্‌থর্‌ ক'রে কাঁপতে লাগলো।

আমরা তখন শিকারের জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। তাড়াতাড়ি বন্দুক নিয়ে গাছটার কাছে যেতে যেতেই তারা লোক দুটোকে একবারে ফেড়ে ফেল্লে। পরক্ষণেই একসঙ্গে তিনটে রাইফেল গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌লো আর দুজন হতভাগ্য কুলীর সঙ্গে ভাল্লুক দুটোও রক্তাক্ত দেহে গাছের উপর হ'তে ধপ্‌ ক'রে মাটীতে এসে প'ড়লো।

কি ভয়ানক কাণ্ড! কি ভয়ানক হিংস্র জন্তুগুলো! এত লোকজন, হাতী, তবু ভয়ের নামটি নেই। মানুষ দেখলেই এদের জিঘাংসা একবারে প্রবল হ'য়ে ওঠে।

মাচা তৈরি শেষ হ'য়ে গেলে আমরা মাচাতেই আশ্রয় নিলুম। খাওয়া দাওয়া সব মাচার উপরেই হ'তে লাগলো। নীচে চারটে হাতী আর কুলীরা মিলে আমাদের গাছগুলো ঘিরে র'ইলো। শুকনো পাতা, রাশি রাশি কাঠ যোগাড় ক'রে নিয়ে তারা তাদের চারধারে আগুন জ্বেলে দিলে। সেই আগুনের বেড়াজালের মধ্যে সারারাত

জেগে আমরা নানা জন্তু জানোয়ারের ডাক শুনতে লাগলুম।

পরদিন বেলা সাতটার মধ্যে আহারাদি সেরে নিয়ে হাতীর পিঠে ওঠা গেল। কুলীরা নানা অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে আমাদের সঙ্গে চ'ল্লো।

মাচা পাহারা দেবার জন্য একটা লোকও সেখানে থাকতে রাজী হ'লো না। অগত্যা আমাদের আশ্রয় অরক্ষিত রেখেই যাত্রা ক'রতে হ'লো।

বহুক্ষণ ঘুরে আমরা একটি শিকারও হস্তগত ক'রতে পারলাম না। তখন আমার সাহেবের পরামর্শে আমরা তিনজন তিন দিকে ছড়িয়ে পড়লাম। সঙ্গের লোকগুলো তিন ভাগ হ'য়ে আমাদের সঙ্গ নিলে।

আমি চ'ল্লাম পূব দিকটায়। সে দিকের জঙ্গলটা কিছু পাতলা ছিল। সে দিকের অনেকগুলো বড় বড় শাল ও সেগুন গাছ কাটা ছিল। বড় গাছ পাতলা থাকলেও ঘন লতাগুল্মের অভাব ছিল না। হাতী না থাকলে বোধ হয় পায়ে হেঁটে সে ঘন জঙ্গলের ভিতর ঢোকা সম্ভব হ'তো না। ঝোপ জঙ্গল পায়ে দ'লে, শুঁড় দিয়ে গাছের ডালপালা ভেঙে পথ ক'রে হাতীটা এগিয়ে চ'লেচে। আমার সঙ্গী কুলীরা কুড়ুল, টাঙী, রামদার সাহায্যে পথ ক'রে নিয়ে ধীরে ধীরে এগুচ্চে,

এমন সময় হাতীর পায়ের কাছ হ'তেই একটা বাঘ ছিট্‌কে বেরিয়ে কুলীদের মধ্যে লাফিয়ে প'ড়লো। চলন্ত হাতীর পীঠ থেকে তাড়াতাড়ি গুলি করবার সুযোগ পেলাম না। ভাবলুম দু-একটা কুলীর আয়ু বুঝি শেষ হ'লো।

কিন্তু আশ্চর্য্য দেখলাম আসামী কুলীদের ক্ষিপ্রকারিতা। তারা নিমিষে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে প'ড়লো আর সঙ্গে সঙ্গে দুতিন দিক হ'তে তার দিকে বল্লম ছুঁড়ে মারলে। তাদের লক্ষ্যও অসাধারণ। একবারে দুটি বল্লম দু'দিক থেকে তাকে বিঁধে ফেল্লে। বাঘটা তবুও গর্জ্জন ক'রতে ক'রতে তাদের ধাওয়া ক'রতে গেল। কিন্তু আর একটা আসামীর ধারাল টাঙীর একঘা মাথায় প'ড়তেই সে দাঁত বার ক'রে বনের মধ্যে চিৎ হ'য়ে প'ড়লো।

ঘণ্টাখানিক যাবত কোন জানোয়ার সুমুখে প'ড়লো না। মাঝে মাঝে বন জঙ্গলের শব্দ আর তাদের গর্জ্জন শুনতে লাগলাম। একটু পরেই সুমুখে দেখলাম একটা প্রকাণ্ড বাঘ। আমার হাতীর দশ হাত আগে সেটা মাটীতে থাবা গেড়ে বিকট গর্জ্জন আরম্ভ ক'রলে। বুঝলাম সেটা একবারে মরিয়া হ'য়ে উঠেচে। এত কাছে আর ঠিক সুমুখে ব'লে গুলি করবার সুযোগ পেলাম না।

রাইফেল তুলেই দেখি সুমুখে মাহুতের মাথা। শেষে কি

বাঘ মারতে গিয়ে মাহুতের মাথাটাই উড়িয়ে দেব ? তাড়াতাড়ি রাইফেল নামিয়ে নিলাম। ঠিক সেই অবসরে ভয়ানক একটা গর্জ্জন ক'রে বাঘটা লাফ দিয়ে হাতীর মাথায় উঠ্‌তে গেল। ভাবলাম সর্ব্বনাশ! হাতীটাকেই বুঝি সাবাড় করে। কিন্তু হাতীটাও খুব শিকারী। সে শুঁড় বাড়িয়ে উপর থেকেই বাঘটাকে ধ'রে ফেল্লে। সঙ্গে সঙ্গে মাটীতে এক আছাড়। বাঘটা উঠ্‌বার চেষ্টা ক'রছিলো। কিন্তু সেই মুহুর্ত্তেই হাতী তার উপরে একশো মণ ওজনের পা-খানি চাপিয়ে দিতেই সে একেবারে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হ'য়ে গেল।

তখন বেলা তিনটে। শীতকালের দিন। সাড়ে পাঁচটাতেই সন্ধ্যে হ'য়ে প'ড়বে। আমরা এসে পড়েচিও অনেক দূর। এতখানি পথ আবার ফিরে যেতে হবে। অগত্যা সে দিনের মত শিকার শেষ ক'রে আমরা ফিরে আসতে লাগলাম। [illegible]বার পথে দু তিনটে বাঘ আর ভাল্লুক চ'খে প'ড়লো। কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে ব'লে সে গুলোকে রেহাই দিয়ে আমরা বেলা পাঁচটার সময় আমাদের আশ্রয়ে ফিরে এলাম।

ফরেষ্টার সাহেব আমার একটু আগেই ফিরেছিলেন। তিনি ও দুটো ভাল্লুক আর একটা বাঘ মেরে এনেচেন দেখলাম। শুনলাম তিনি একটা গণ্ডারের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। কিন্তু

সেটা এমন দৌড় দিলে সে তাকে আর তিনি খুঁজেই পেলেন না।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা এসে গেল। আমার সাহেব তখনও ফিরলেন না দেখে আমরা ভারী বিব্রত হ'য়ে পড়লাম। আমাদের যে রকম বন্দোবস্ত ছিল তাতে সাড়ে পাঁচটার পূর্ব্বেই সকলের ফিরে আসার কথা। কিন্তু পৌনে ছটা হ'য়ে গেল তবু তার দেখা নেই। তাঁর সঙ্গের কুলীদেরও সাড়া পাওয়া গেল না।

আমরা ভারী উৎকন্ঠিত হ'য়ে উঠ্‌লুম। ভাবলাম, তবে কি সাহেব বিপদগ্রস্থ হ'য়েচেন? কিন্তু তা হ'লেও তো সঙ্গের কুলীরা ফিরে আসবে। আর হাতী? সেটাই বা যাবে কোথায়?

হঠাৎ দূরে মশালের আলো আর কোলাহল শুনতে পেলাম। সকলেরই মুখ প্রসন্ন হ'য়ে উঠ্‌লো। তা হ'লে সাহেব ফিরচেন।

কিন্তু কুলীরা ফিরে এল বিষণ্ণ মুখে দুটো বাঘ আর একটা ভাল্লুক নিয়ে। সাহেবও নেই, তাঁর হাতীও নেই। কেবল মাহুতের ছিন্ন ভিন্ন মৃত দেহটা তারা কাঁধে করে ফিরিয়ে এনেচে। বুঝলাম ব্যাপার খুব সাংঘাতিক।

কুলীরা ব'ল্লে সাহেব বেশ আরামে শিকার ক'রছিলেন।

ভাল্লুকটা গাছ হ'তে লাফ দিয়ে......মাহুতটাকে জড়িয়ে ধ'রলে

প্রথমেই তিনি দুটো বাঘ মারেন। তারপর তিনি একটা বুনো শুয়োরের পিছনে তাড়া করেন।

যাবার পথে একটা প্রকাণ্ড ভাল্লুক গাছের ডালে পাতার ভিতর লুকিয়ে ব'সেছিল। সাহেব নিজে, বা দলের কেউই তাঁকে দেখতে পায়নি।

সাহেবের হাতী গাছের তলা দিয়ে যাবার সময় ভাল্লুকটা গাছ হ'তে লাফ দিয়ে হাতীর কাঁধের উপর পড়ে আর মাহুত-টাকে জড়িয়ে ধ'রে তাকে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে থাকে। হাতীটাও হঠাৎ ভয় পেয়ে ক্ষেপে উঠে সাহেবকে নিয়ে বন জঙ্গল ভেঙে ছুটতে থাকে।

সাহেব খুব তাড়াতাড়ি গুলি চালিয়েছিলেন। তার ফলে ভাল্লুকটা মাহুতকে জড়িয়ে নিয়ে নীচে প'ড়ে যায়। কুলীরা দৌড়ে কাছে গিয়ে মাহুতকেও মরা দেখতে পায়।

প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়ে তারা বহুদূর পর্য্যন্ত সাহেব আর হাতীর খোঁজ ক'রে বেড়িয়েচে, কিন্তু কোথাও তাদের দেখতে পায় নি। শেষে সন্ধ্যা হ'য়ে আসচে দেখে তারা অনুসন্ধান ছেড়ে, মশাল জ্বেলে অতি কষ্টে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেচে।

কুলীদের কথা শুনে মাথায় হাত দিয়ে ব'সলাম। কি সর্ব্বনাশ! তা হ'লে তো সাহেবের বড় বিপদ! তিনি এতক্ষণ বেঁচে আছেন কি না তাই সন্দেহ। এই ভীষণ জঙ্গল তার

উপর রাত্রিকাল। কোথায় তিনি আশ্রয় পাবেন ? ক্ষ্যাপা হাতী তাঁকে কোথায় নিয়ে গিয়ে হাজির হবে তাই বা কে বলতে পারে ? মাহুত নেই। সে আর পথ, অপথ মানবে না—যে দিকে খুসী সেই দিকে ছুটবে। তারপর গাছ, পালা, বন, জঙ্গলের ধাক্কা লেগে যদি তিনি হাতীর পীঠ হ'তে প'ড়ে যান, তাহ'লে হয় হাতীটা নিজেই তাঁকে মেরে ফেলবে, না হয় হিংস্র জানোয়ারদের হাতে তাঁর প্রাণ যাবে।

আসামের জঙ্গল। তায় অন্ধকার রাত। এ সময়ে কারও খোঁজে বার হওয়া মানুষের অসাধ্য। তাহ'লে উপায় ?

ফরেষ্টার সাহেব বল্‌লেন তিনি আর বেঁচে নেই এ কথা ধ্রুব সত্য। এমন কি তাঁর দেহের শেষ টুক্‌রোটি পর্য্যন্ত নিশ্চয় এতক্ষণ হিংস্র পশুদের উদরস্থ হ'য়ে গিয়েচে।"

কিন্তু তবু একবার খোঁজ নিয়ে দেখা উচিত। কি জানি, যদি তিনি কোথাও আশ্রয় নিয়ে বেঁচে থাকেন ?

কথাবার্ত্তার পর সব ঠিক হল যে—কাল ভোর হ'তে প্রাণ-পণে চেষ্টা করা যাবে। তাতে আমাদেরও প্রাণ যায় ক্ষতি নেই।"

তারপর যে যার খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে পড়লো। একদল পালাক্রমে 'পাহারা দেবার জন্যে জেগে ব'সে র'ইলো।

ফরেষ্টার সাহেব বেশ নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে লাগলেন। কিন্তু আমার চ'খে আর ঘুম এলো না। সাহেবের জন্মে আমার মন বড়ই অস্থির হ'য়ে প'ড়লো। সে রাত্রে আমি আর কিছু খেলাম না। মাচার উপর শুয়ে কেবল সাহেবের কথাই ভাবতে লাগলাম।

খুব ভোরে উঠেই রীতিমত গোছ গাছ ক'রে নিয়ে সকলে এক সঙ্গে সাহেবের খোঁজে বেরুলাম।

যেখানে ভাল্লুকটা মাহুতকে আক্রমণ ক'রেছিলো, আমার সাহেবের কুলীরা আমাদের সেই দিকেই নিয়ে চ'ল্লো।

দু ঘণ্টার মধ্যে ঘটনাস্থলে পোঁছে ভাল্লুক আর মাহুতের মৃতদেহ দেখলাম। তারপর যে পথে হাতীটা সাহেবকে নিয়ে ছুটে ছিল সেই পথে আমরা সদল বলে এগুতে লাগলাম। কিন্তু হাতীর পথের সন্ধান কিছুতেই ক'রতে পারলাম না।

তখন বুঝলাম বিষম সমস্যা। এরকম ভাবে একদিকেই যদি সকলে যাওয়া যায় তা হ'লে সাহেবের সন্ধান পাওয়া অনিশ্চিত। অগত্যা সেই স্থান হ'তে আমরা দুটো দল হ'য়ে দুই দিকে যাত্রা ক'রলাম।

ফরেষ্টার সাহেবের সঙ্গে দুটো হাতী আর অধিকাংশ

গম্ভীর জঙ্গলে

কুলীদের পাঠিয়ে দিয়ে আমি মাত্র দশজন অনুচরের সঙ্গে অপর দিকে চল্লাম।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত বিশেষ বিপদের মুখ দেখতে হয় নি। কিন্তু তার পরেই একটা অঘটন ঘ'টে গেল।

আমাদের যাবার পথে একটা প্রকাণ্ড গণ্ডার গাছের গুঁড়িতে তার শৃঙ্গটা ঘষ্‌ছিলো। সাড়া পেয়েই সে একটা বিকট আওয়াজ ক'রে আমাদের তাড়া ক'রলে। সুমুখে ছিল কুলীর দল। গণ্ডারটা একবারে দলের মধ্যে ঢুকে দুটো লোককে ফেড়ে ফেল্‌লে। তখন তারা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে যে যেদিকে পারলে, পালাতে লাগলো। আমি পর পর দুটো গুলি চালালাম। কিন্তু তাতে সে ভ্রূক্ষেপও করলে না। শেষে আমার হাতীর দিকে সে তেড়ে আসতে লাগলো।

হাতীটা গণ্ডারের উগ্রভাব দেখে, বন-জঙ্গল ভেঙে একদিকে ছুটতে লাগলো। মাহুতের তাড়না, অঙ্কুশ কিছুই সে আর গ্রাহ্য ক'রলে না। প্রাণপণ শক্তিতে মাহুত আর আমাকে নিয়ে ছুটতে আরম্ভ করলে।

মাহুত প্রাণপণে হাতীটাকে থামাবার চেষ্টা ক'রতে লাগলো। তার নানা রকম চালনা কৌশল, তার অঙ্কুশের ঘন ঘন আঘাত, সে সব অবজ্ঞা ক'রে তীরবেগে একদিকে ছুটতে লাগলো।

দেখতে দেখতে একটা গাছের মোটা শাখায় ধাক্কা খেয়ে মাহুত ছিটকে হাতীর পিঠ থেকে নীচে প'ড়ে গেল। তাকে সেই অবস্থায় ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে বাঘ ভাল্লুকের মুখে ফেলে রেখে, হাতী আমাকে নিয়ে ছুটল।

কিছুক্ষণ পরে একটা সংকীর্ণ নদীর ধারে এসে প'ড়লাম। ওই জঙ্গলের মধ্যেই সে নদী। তাকে ঠিক নদী বলাও চলে না। একটা প্রাকৃতিক সরু খাল মাত্র। পাহাড় থেকে ঝরণার জল ওই খাল দিয়ে বোধ হয় কোন নদীতে গিয়ে প'ড়চে। খালের দুই পাশে কেবল পাথরের রাজত্ব।

হাতীটা আমাকে নিয়ে সেই খালের জলে নেমে প'ড়লো। খালটি যদিও বেশী চওড়া নয়, তবু সেটি বেশ গভীর। একটু-খানি যেতেই হাতীর পিঠ ডুবে গেল। আমার শরীরেও জল স্পর্শ ক'রলে।

আত্মরক্ষার আর কোন উপায় না পেয়ে আমি হাতীর পিঠ থেকে জলে নেমে প'ড়লাম। তারপর সাঁতরে তীরে এসে উঠ্‌লাম।

তীরে এসে প্রাণপণে ছুট্‌তে লাগলাম। আমার উদ্দেশ্য আত্মরক্ষার জন্যে একটা উপযুক্ত আশ্রয় খুঁজে নেওয়া।

একটুখানি যেতেই একটা প্রকাণ্ড পাথরের স্তূপ চ'খে

আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম······এখানে ভাল্লুক মারলে কে ?

প'ড়লো। ঠিক যেন একটী ছোট পাহাড়। স্তুপটিতে মাটীর সংস্পর্শ নেই। কেবল অনেকগুলো বড় বড় কালো পাথর কে যেন সীমেণ্ট দিয়ে এক সঙ্গে এঁটে রেখে দিয়েচে।

একটু কাছ বরাবর যেতেই দেখলাম স্তুপটির সুমুখে একটা ভাল্লুক ম'রে প'ড়ে রয়েচে। তার শরীরের দু তিন স্থান হ'তে রক্ত বেরিয়ে সেখানকার পাথরের উপর জ'মে কালো হ'য়ে আছে।

আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম। এখানে ভাল্লুক মারলে কে? দেখলাম তার শরীরে দু তিনটে গুলির আঘাত। তা হ'লে ভাল্লুকটাকে গুলি ক'রেচে কেউ নিশ্চয়। কিন্তু কে সে? এখানে কেমন ক'রে এল?

সন্দিগ্ধভাবে চারিদিকে ভালো ক'রে চাইতেই দেখলাম স্তুপটির সুমুখে দুচার খণ্ড পোড়া কাঠ আর একরাশি ছাই। তার পাশেই স্তুপের গা ঘেঁসে কতকগুলি বড় বড় পাথর ওপর ওপর এমন ভাবে সাজানো যে দেখলেই বোঝা যায় যে কোন লোক সে গুলিকে সাজিয়ে রেখে দিয়েচে।

অবাক হ'য়ে সেই দিকে চেয়ে আছি—হঠাৎ ভিতর থেকে ধাক্কা দিয়ে কে যেন সেই পাথরগুলো ধ'সিয়ে ফেল্লে। সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলাম Halo Jhantu! I'm glad to see you. But how you come here?

কথা ব'লতে ব'লতেই ভিতর হ'তে গুঁড়ি মেরে সাহেব বেরিয়ে এলেন। আমি অবাক হ'য়ে তাঁর মুখের পানে চেয়ে রইলাম।

সাহেব বল্লেন—"আমি জানি তোমরা আমাকে খুঁজতে বেরুবে। কিন্তু এরকম দুর্গম স্থানে তোমরা যে আমাকে খুঁজে বার করবে এ আশা মোটেই করিনি। যাহোক তোমাকে দেখে ভারী খুসী হয়েচি। কিন্তু এস্থান নিরাপদ নয়। ভিতরে এসো, সব কথা বলচি।"

সাহেবের পিছন পিছন গুঁড়ি মেরে গুহাটার মধ্যে ঢুকলাম। গুহাটি চওড়া দু-হাত আর লম্বায় প্রায় দশ হাত হবে। তার ভিতরে দাঁড়াবার উপায় না থাকলেও বেশ স্বচ্ছন্দে ব'সে থাকা যায়।

বুঝলাম এই নির্জ্জন দূর্গম স্থানে এই রকমের একটি গুহা পেয়েছিলেন ব'লেই সাহেব এতক্ষণ পর্য্যন্ত সুস্থ শরীরে বেঁচে আছেন।

সাহেব ব'ল্লেন—"কুলীদের কাছে আমার দুর্ঘটনার কথা শুনেছ বোধ হয়! মাহুত মরবার পর হাতীটা আমাকে নিয়ে যে রকম ভাবে ছুট্‌লো, তাতে বুঝলাম যে আমারও আর রক্ষা নেই। অনেক কষ্টে বন, জঙ্গল, ডাল, পালা থেকে নিজেকে বাঁচাতে লাগলুম। হাতীর পিঠে থাকলে মরণ অবশ্যম্ভাবী

জেনে কোন রকমে নামবার উপায় খুঁজতে লাগলুম কিন্তু মিনিট কুড়ির মধ্যে কোন উপায় দেখতে পেলাম না শেষে আমার মাথার দু হাত উপরে একটা গাছের মোটা ডাল দেখতে পেলাম। হাতীটা তার তলা দিয়ে যাবার সময় আমি উঠে দাঁড়িয়ে টপ্ ক'রে সেই ডালটা দুহাত দিয়ে আঁকড়ে ঝুলে পড়লাম। হাতীটা নিজের গোঁভরে চ'লে গেলে, আমি লাফ দিয়ে নীচে প'ড়লাম।

আশ্রয়ের জন্যে চারিদিকে চেয়ে ছুট্‌তে ছুট্‌তে এই গুহাটা দেখতে পেলাম। কিন্তু এর ভিতর থেকে একটা উগ্র গন্ধ বেরুতে দেখে বুঝলাম এটি একটী জানোয়ারের বাসস্থান। পকেটে টর্চ্চলাইট ছিল। তার সাহায্যে ভিতরটা দেখে বুঝলাম উপস্থিত কোন জন্তু এর মধ্যে নেই। আমি আর কালবিলম্ব না ক'রে এর মধ্যে ঢুকে প'ড়লাম।

একটু পরেই দেখলাম একটা প্রকাণ্ড ভাল্লুক গুহা সম্মুখে হাজির। বুঝলাম এটা তারই আড্ডা। ভিতর থেকে গুলি চালালাম। পর পর তিনটে গুলি মারতে তবে সেটা ম'লো।

নিজেকে সুরক্ষিত করবার জন্যে গুহার বাইরে গেলাম। খালের ধারে কতকগুলি বড় বড় পাথরের চাঁই র'য়েচে দেখে এক এক ক'রে এই কটা পাথর ব'য়ে আনলাম। স্তূপটার

পাশে কতকগুলি গাছের গুঁড়ি, ডাল, পাতা, কাটা প'ড়ে ছিল। তারই গোটাকতক ব'য়ে এনে গুহাটার স্থমুখে কাঁড়ি ক'রলাম।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হ'য়ে এল। আমি কাঠের স্তুপে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গুহার মধ্যে ব'সে রইলাম। সারারাত্র জেগে কাটিয়েচি। রাত্রে অনেকগুলো জানোয়ার আশপাশে হামলে বেড়িয়েচে। কিন্তু আগুন দেখে কেউ কাছে আসতে সাহস করেনি। সকালের দিকটায় একটু ঘুমিয়েচি। ঘুম ভাঙতেই তোমাকে দেখতে পেলাম।

চুপ ক'রে সাহেবের কথাগুলো শুনে বুঝলাম রাখে হরি মারে কে! আমার কথাও সাহেবকে বল্লাম। সাহেব তা শুনে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন।

তারপর উদ্ধারের চেষ্টায় দুজনে গুহার বাইরে গিয়ে স্তুপের পাশ হ'তে কতকগুলো মোটা মোটা ডাল, আর একটা গাছ থেকে গোটাকতক লতা টেনে, এনে,—লতা, আর শুকনো ডালের সাহায্যে দুইটি ছোট ভেলা তৈরী করলাম। তারপর দুজনে পালাক্রমে জাগতে জাগতে গুহার মধ্যে রাতটা কাটিয়ে দিলাম।

ভোরে উঠেই দুজন দুখানি ভেলায় উঠে ব'সলাম। নদীতে খুব টান। দাঁড় বাইতে হ'লো না। জলের টানে ভেলা দুটি রীতিমত বেগে চ'ল্লো।

একঘণ্টা পরে আমরা জঙ্গলের সীমানা পেরিয়ে ফাঁকা জায়গায় প'ড়লাম। খালের দু'ধারে কেবল ফাঁকা মাঠ আর মাঝে মাঝে ছোট ছোট জঙ্গল। আরও পাঁচ ছয় ঘণ্টা পরে আমরা ভেলা ছেড়ে কুলে নেমে মাঠ পার হ'য়ে একটুখানি যেতেই দেখলাম একটা হাতী ধরা খেদা।

খেদা হ'তে দুটি ঘোড়া ভাড়া ক'রে নিয়ে শিলচরের দিকে যাত্রা করলাম।

শিলচরে দুই সপ্তাহ বিশ্রাম করা হ'লো। তারপর আমরা কলকাতায় এলাম। সেখানে থাকলাম পাঁচ দিন। কল্‌কাতা হ'তে বম্বে। বম্বে থেকে একখানা বড় জাহাজে আমরা আফ্রিকা যাত্রা করলাম।

চতুর্থ পর্ব্ব

আফ্রিকায়

বম্বে হ'তে যে জাহাজ খানিতে আফ্রিকা যাত্রা ক'রলাম, সেটি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ষ্টিম নেভিগেসন কোম্পানীর জাহাজ। প্রতি চোদ্দ দিন অন্তর বম্বে থেকে একখানি ক'রে জাহাজ আফ্রিকার অভিমুখে যায়। জাহাজে যে নক্সা আছে তা দেখে বুঝলাম জাহাজখানি বম্বে থেকে একদমে সিচিলিস্ দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে থামবে। তারপর পূর্ব্ব আফ্রিকার মোম্বাসা বন্দরে গিয়ে পেঁছুবে।

সমুদ্র-যাত্রা তো দূরের কথা চ'খেও কখনো সমুদ্র দেখিনি। সমুদ্র যে বাস্তবিক কি বিরাট বস্তু তা কখনো ধারণা ক'রতে পারিনি। ভূগোলে সমুদ্রের পরিচয় পেয়েছি, নানা গল্পে ও কবিতায় সমুদ্রের বর্ণনা পাঠ ক'রেছি, কিন্তু তাতে সমুদ্র সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মেছিল তার কোন মূল্যই নেই। স্বচক্ষে দেখে যা বুঝলাম, গল্প শুনে বা বর্ণনা প'ড়ে তার দশ ভাগের একভাগ জ্ঞানও হয়নি।

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ধ'রে, সীমাহীন ধোঁয়ার

রাজ্যের ভিতর দিয়ে, আমাদের প্রকাণ্ড জাহাজখানি ভারত উপসাগরের বুক চিরে অবিশ্রান্ত গতিতে চ'লতে লাগল। সে চলার বিরাম নেই, বুঝি তার শেষ ও নেই।

চ'লেচে তো চ'লেচে। থামবে কবে তা যেন জানি না। বিস্মিত দৃষ্টিতে যে দিকে চাই, কেবল ধোঁয়া, আর কুয়াসা। আমাদের আশে পাশে কিছু দূর পর্য্যন্ত কেবল দেখচি এক একটা পাহাড়ের মত ঢেউ ধেয়ে আসচে। প্রতিক্ষণে মনে হ'চ্চে ঢেউগুলি আমাদের জাহাজের উপর দিয়ে চ'লে যাবে, আর সেই অসীম সমুদ্রের মধ্যে ছোট মোচার খোলার মত জাহাজটি বুঝি কোন্ অতলতলে এক নিমিষে তলিয়ে যাবে। কিন্তু জাহাজের কাছে এসে ঢেউগুলো তলা দিয়েই চ'লে যায়, আর জাহাজখানি তোলাপাড়া খেতে থাকে।

ক্রমে আরব্য উপসাগর পেরিয়ে ভারত মহাসাগরে এসে প'ড়লাম। দিক নির্ণয় যন্ত্র দেখে বুঝলাম আমরা বম্বে থেকে কেবলই দক্ষিণ পশ্চিম দিকে চলেছি। আমাদের জন্যে জাহাজের দোতালায় একটি কেবিন নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু ঘুমোবার সময়টি ছাড়া আমি সকল সময়ে ডেকের উপরেই ব'সে থাকতাম।

ডেকের উপর ব'সে, দিগন্ত বিস্তৃত ধোঁয়াচ্ছন্ন জলরাশির দিকে চেয়ে চেয়ে কত কথাই আমার মনে আসতো। মনে

হ'তো কোথাকার কে আমি, আর কোথায় চলেচি। কোথায় বঙ্গদেশের এক নিভৃত পল্লী, আর কোথায় এই ভারত মহাসাগর। তারপর কোথায় বা সেই অপরিচিত প্রদেশ আফ্রিকা।

ভাবতুম, আর প্রাণে একটা মহা গৌরব অনুভব ক'রতুম। ভেতো বাঙালীর ছেলে আমি। তবু আজ আমি কি দুঃসাহসিকতার কাযেই অগ্রসর হ'য়েচি। কুনো ব্যাংএর মত যে জাত কেবল দিনরাত ঘরের মধ্যে বন্ধ থাকতেই জানে, নিজের বাস্তুর সিমানার বাইরে যেতে হ'লেই যে জাত পাঁজি খুলে বসে, বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগিনী, দিকশূল ইত্যাদির বিচার ক'রতে ক'রতে যারা নিজেদের প্রতি পদক্ষেপেই বাধা খুঁজে বার করে, সেই জাতের ছেলে তো আমি?

পা বাড়াতেই হাঁচি, টিকটিকির শব্দে চ'মকে উঠে যারা আবার পা টেনে নেয়, পাছু ডাক শুনলেই যাদের যাত্রা স্থগিত রাখতে হয়, কাকের ডাকে বা শূন্য কলসী দর্শনে যাদের পা বাড়ানো দুঃসাধ্য হ'য়ে পড়ে, আমি তো তাদেরই বংশধর?

বিদেশের একশো টাকার চেয়ে দেশের দশ টাকা যাদের বাঞ্ছনীয়, বিপদের আশঙ্কায় সাহসের কাজ ছেড়ে দিয়ে, নিজেদের ঘরের মধ্যে উপবাস ক'রে ম'রে থাকাও যারা শ্রেয় মনে করে, আমি তো তাদেরই একজন? তবু আমি কি গৌরবময় জীবন

বরণ ক'রে নিয়েচি ! বাঙালী জাতের জাতিগত চির দুর্ব্বলতার পরিবর্ত্তে একি মহাণ প্রেরণা আমাকে বীর জাতের অনুসরণীয় পথে টেনে নিয়ে যাচ্চে !

আবার ভাবি পৃথিবী না জানি কত বড়, কত বিরাট। তাঁর বুকে কত সাগর, মহাসাগর ; কত দেশ, মহাদেশ ; কত দ্বীপ, কত কি রয়েচে। তার এক একটির দৈর্ঘ্য কত, কত বিস্তার। এক ভারত মহাসাগর দেখেই আমার চক্ষু স্থির। তবু তার কতটুকুই বা দেখেচি ?

আমার মনে হ'লো কি অসাধারণ এই পাশ্চাত্য জাতী ! যারা দুর্দ্দমনীয় পণ, অসীম অধ্যবসায়, আর অপ্রতিহত সাহস নিয়ে, বিপদ, মরণ তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে, মহীধর ডিঙিয়ে, মহাসাগরে পাড়ি দিয়ে, দেশ মহাদেশ পার হ'য়ে, সারা পৃথিবীময় তাদের বীরত্বের জয়ডঙ্কা বাজিয়ে বেড়িয়েচে।

এমন না হ'লে মানুষ ? আর আমরা ? আমরা কি ? এক গ্রাম হ'তে আর এক গ্রামে যেতে হ'লে দশবার এগুই, দশবার পেছুই। কোন কাজে সামান্য একটু বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই আমরা সে কাজ পরিত্যাগ করি। কোথাও একটু মারারারি দাঙ্গার নাম শুনলেই আমরা দোরে খিল এঁটে ঘরের মধ্যে ব'সে থাকি। শেয়াল কুকুরের ভয়, চোরের ভয়, ভূতের ভয়, ভয় আর ভয়। শিশুকাল হ'তে ভয়ই

আমরা শিক্ষা পেয়ে আসি। কাঁদলে জুজুর ভয়, না ঘুমুলে হুমোর ভয়, বাইরে গেলে ভূতের ভয়, না পড়লে পণ্ডিতের ভয়। রোদে বেড়ালে জ্বর হবার ভয়, জলে ভিজলে সর্দ্দির ভয়, গাছে উঠ্‌লে প'ড়ে মরার ভয়। ভয় পদে পদে, ভয় সব কাজে।

কাজেই সাহস ব'লে কোন জিনিসের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় না। কিন্তু সাহসই বল, সাহসই শক্তি, সাহসই মনুষ্যত্ব প্রচারের প্রধান পন্থা। সাহস আছে ব'লেই পাশ্চাত্য জাতী পৃথিবী জয়ী। সাহস নেই ব'লেই আমরা সব হারিয়ে আজ পরমুখাপেক্ষী।

আমার মনে হ'লো যে আমাদের এই শৈশব হ'তে প্রাণপাত ক'রে লেখাপড়া শেখা, এই সাহিত্য, ব্যাকরণ, গণিত, ইতিহাস, বিজ্ঞান নিয়ে দেহের রক্ত জল করা, এ সব পণ্ডশ্রম। সাহস না থাকলে এর কোনটিরই সদ্ব্যবহার হয় না। প্রাণের ভয়কে তুচ্ছজ্ঞান ক'রে আমরা অসীম দুঃসাহসের সঙ্গে নানা সাহসিকতার কাজ ক'রতে না শিখলে, কোনকালেই আমাদের গতিমুক্তি হবে না।

এই রকমের নানা কথা ভাবতে ভাবতে আর অনন্তনীল সমুদ্রের তরঙ্গলীলা দেখতে দেখতে দিনের পর দিন কাট্‌তে লাগলো। নয়দিনের দিন সিচিলিস দ্বীপপুঞ্জে আমাদের জাহাজ নোঙর ক'রলে।

দীর্ঘ নয় দিন পরে চ'খে স্থল দেখতে পেলাম। বন্দরে নানা জাতের লোক। সেখানে মাত্র একদিন বিশ্রাম করলাম। তারপর আবার জাহাজ চ'লতে লাগলো।

এবার জাহাজের গতি বদলে গেল। বম্বে থেকে বরাবর দক্ষিণ পশ্চিমে এসেচি। এবার জাহাজ চ'ল্লো ঠিক পশ্চিমে। আমাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। তাই পথে ঝড়, জল পাইনি। নইলে কি হ'তো তা কে জানে।

তিমিমাছের নাম বইতেই প'ড়েচি। কখনো তা চ'খে দেখবার সৌভাগ্য হয়নি। এবার ভারত মহাসাগরের মাঝখানে দু তিনটে ভাসতে দেখলাম। বাপরে! কি প্রকাণ্ড দেহ! বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে এত বড় জীব থাকতে পারে তা মনেই করিনি।

আর একটা জীব দেখলাম, যার কথা মনে হ'লে এখনো গা শিউরে ওঠে। সে নাকি সামুদ্রিক অজগর।

তখন সিচিলিস হ'তে দুদিনের পথ আসা গেচে। অনুকুল বাতাসে জাহাজ বেশ স্বচ্ছন্দে ছুটেচে। আমি দোতলার ডেকে ব'সে সমুদ্রের দিকে চেয়ে আছি। হঠাৎ আমাদের জাহাজ হ'তে প্রায় চার শো হাত দূরে কি একটা ভাসতে দেখা গেল। তার দেহটা জলের নীচে, কেবল পীঠের কাঁটা-গুলো জলের উপর দেখা যাচ্চে। এর যেন আর শেষ নেই।

যতদূর যাই, কেবল সেই কাঁটার সারি। একটা জীব এত লম্বা হ'তে পারে? দু মাইলের উপর যেতে তবে সে কাঁটা শেষ হ'লো।

সাহেব ব'ল্লেন "এরা এক একটা দুই হ'তে তিন মাইল পর্য্যন্ত লম্বা হয়। মাঝে মাঝে এরা প্রকাণ্ড জাহাজের ডেকের উপর থেকে মানুষ ধ'রে গিলে খায়। একবার নাকি এই রকমের একটা অজগর একটা প্রকাণ্ড তিমিমাছকে জড়িয়ে ধ'রে সমুদ্রের জল থেকে শূন্যে তুলে ধ'রেছিল।

শুনে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেল। বাপরে! কি ভয়ানক সাপ!

সিচিলিস থেকে জাহাজ ছাড়বার পর তিন দিনের দিন পূর্ব্ব আফ্রিকার মোম্বাসা বন্দরে পৌঁছুলাম।

মোম্বাসা প্রকাণ্ড বন্দর। বহু লোকের সেখানে বাস। ইংরাজ, ফরাসী, ডচ, মার্কিন, নানা জাতের লোক ব্যবসা সূত্রে সেখানে আড্ডা গেড়েচে। কাফ্রি, নিগ্রো প্রভৃতি আফ্রিকার অধিবাসীও বিস্তর।

আমরা ইষ্ট আফ্রিক্যান্ লজ নামক একটা প্রকাণ্ড ইউ-রোপীয় হোটেলে বাসা নিলাম। সেখানে এক সপ্তাহ বিশ্রাম করবার পর মোম্বাসা হ'তে রেলযোগে ভিক্টোরিয়া হ্রদের অভিমুখে যাত্রা ক'রলাম। ভিক্টোরিয়া হ্রদ মোম্বাসার পশ্চিমে

মধ্যআফ্রিকার দিকে। মোম্বাসা হ'তে তার দূরত্ব ছয় শো মাইলের উপর। আমরা এক স্থানে ট্রেণ থেকে নামলাম।

ভিক্টোরিয়া হ্রদ সেস্থান হ'তে পঞ্চাশ মাইল। সে দিকে রেল নেই। পায়ে হেঁটে কিম্বা হাতীর পিঠে সেখানে যেতে হয়। আমরা সেখানে ট্রেণ ব'দলে ভিক্টোরিয়া হ্রদের উত্তর পূর্ব্ব দিকে কিসুমু নামক স্থানে গেলাম। কিসুমুতে আবার রেল ব'দলে তিন শো মাইল দূরে ইউগ্যাণ্ডা নামক স্থানে পেঁ ছুলাম।

এই তিন শো মাইল রেল পথ বড়ই সঙ্কট পূর্ণ! কেবল পাহাড়, জঙ্গল, আর তরাইএর মাঝ দিয়ে এই পথ। পথের দুই ধারে গভীর অরণ্য আর লম্বা তৃণাচ্ছাদিত উপত্যকা। তাতে কোন রকম বন্য জন্তুরই অভাব নেই।

মাঝে মাঝে রেল লাইনের উপর গণ্ডার, হাতী, জলহস্তি এসে পথ আটকে প'ড়ে থাকে। বাঁশী দিয়ে, বন্দুকের আওয়াজ ক'রে তবে ট্রেণ চালাতে হয়।

দেখলাম শিকারের উপযুক্ত দেশেই যাচ্ছি।

ইউগ্যাণ্ডায় বৃটিশ সেনানিবাসে আমরা আশ্রয় নিলাম। আমার সাহেব সাধারণ লোক নন। সেখানে সেনানীদের মধ্যেও তাঁর দু'তিনজন পরিচিত বন্ধু র'য়েচেন দেখলাম।

প্রায় দুই সপ্তাহ আমরা সেনানিবাসে র'ইলাম। সেখান

হ'তেই শিকারের সব আয়োজন ঠিক হ'য়ে গেল। আরও তিনজন ইংরাজ শিকারী আমাদের সঙ্গে শিকারে যেতে চাইলেন। আমাদের সঙ্গে নানা রকমের সরঞ্জাম, তাঁবু, রসদ, অস্ত্র,শস্ত্র, ডিনামাইট ইত্যাদি বিস্তর রকমের জিনিস নেওয়া হ'ল। আফ্রিকার নিগ্রো আর কাফ্রি জাতীয় কুলী নেওয়া হ'লো পঞ্চাশ জন। প্রচুর খাদ্য, ওষুধ, ব্যাণ্ডেজ. ইত্যাদির তো কথাই নেই।

এই রকমের বিরাট আয়োজন ক'রে আমরা চ'ল্লাম শিকার করতে। ইউগ্যাণ্ডার পরেই বেলজিয়ানদের অধিকৃত কঙ্গো প্রদেশ। তার মধ্যে কঙ্গো নদীর দুই পাশেই গভীর জঙ্গল। তেমন প্রকাণ্ড জঙ্গল আশপাশে আর কোথাও নেই। সেই জঙ্গলে সব রকমের জানোয়ার প্রচুর পাওয়া যায়। তা ছাড়া নানা জাতীয় নরখাদক বুনো মানুষও আছে। হিংস্র পশুদের চেয়ে তারা নাকি আরও ভয়ঙ্কর। পশুদের হাতে রক্ষা আছে। কিন্তু তাদের হাতে বাঁচা দুষ্কর। সাহেবেরা সেই জঙ্গলই শিকার অভিযানের জন্যে মনোনীত ক'রলেন।

বহুকষ্টে অনেক বাধা, বিঘ্ন, অতিক্রম ক'রে যে অল্প পরিসর নদীর তীরে আমরা উপস্থিত হ'লাম, সেটি কঙ্গোরই একটি শাখা নদী। তার দুই ধারে গভীর বন আর ছোট বড় পাহাড়। তার মধ্যে দেখলাম একটি পাহাড় বেশ পরিষ্কার।

নীচের দিকে জঙ্গল আছে কিন্তু উপর জঙ্গল শূন্য। পাহাড়টি কাল পাথরে মোড়া। তাই তার উপর গাছ পালা জন্মাবার সুবিধা পায় নি।

সেই পাহাড়ের উপর আমরা তাঁবু ফেল্লাম! পাশাপাশি দুটি বড় তাঁবু। একটিতে আফ্রিকার তিনজন ইংরাজ শিকারী আর অন্যটিতে আমার সাহেব আর আমি রইলাম। আমাদের চারধারে অনেকগুলো ছোট ছোট তাঁবু খাটিয়ে তার ভিতর কুলীরা আড্ডা নিলে। রাশি রাশি লতা, পাতা, কাঠ যোগাড় ক'রে কুলীরা রাত্রে তাঁবুর চারপাশে আগুন জ্বালবার ব্যবস্থা ক'রলে। পরদিন শিকারে যাওয়া হবে এই ঠিক করে আমরা সেদিন আর রাতটা তাঁবুতেই কাটালাম।

যে করে রাত্রি কাটলো, তা আর ব'লে কাজ নেই। আফ্রিকার মত দেশে, রাত্রিবাসের পর আবার দিনের আলো দেখার আশা করাই উচিত নয়। কেবল সঙ্গে ওই দেশেরই অসভ্য লোকদের নিয়ে যাওয়া হ'য়েছিল তাই রক্ষে। তারা তাঁবুর চারিদিকে এমনভাবে আগুন জ্বেলে রেখেছিল যে সেই পাহাড়ে উঠতেই কোন জানোয়ারের সাহস হয় নি।

প্রত্যুষে তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে সবাই তৈরী হ'য়ে পড়লাম! রীতিমত সাজ সরঞ্জাম সঙ্গে নেওয়া হ'ল। দশজন দেশীয় কুলীকে তাঁবু রক্ষার জন্যে রেখে, বাকি চল্লিশ জনকে

নিয়ে আমরা পাঁচজন শিকারী যাত্রা করলাম। কুলী দশজন সমানে আগুন জ্বেলে রেখে, তীর ধনুক, বর্ষা ইত্যাদি নিয়ে তাঁবু পাহারা দিতে লাগলো।

আমাদের বিরাট দলটি নদীর ধারে ধারে সারি দিয়ে চলতে লাগলো। কিছুদূর গিয়ে জঙ্গলের ভিতর ঢোকা হ'বে এই রকমই আমাদের মতলব ছিল। সিকি মাইল যেতেই দেখি একটা বোট। সকলে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। একি! এখানে, এই জঙ্গলের ভিতর বোট কে আনলে? সকলে বিস্মিতভাবে বোটটার দিকে চেয়ে এগুচ্চি, হঠাৎ শিকারী সাহেবদের মধ্যে একজন চিৎকার ক'রে উঠ্লেন। "Hallo, That's the boat." আমরা অবাক হ'য়ে গেলাম।

শিকারী সাহেবকে জিজ্ঞাসা ক'রতে তিনি ব'ল্লেন,—"মাস দুই আগে ইউগ্যাণ্ডার বৃটিশ সেনানিবাস থেকে দুজন শিকারী আর পাঁচ ছয়জন অনুচর এই জঙ্গলে শিকার ক'রতে আসেন। তাঁরা বেলজিয়ান কঙ্গোর কোন সহর হ'তে এই বোটখানি নিয়ে কঙ্গো নদী বেয়ে ক্রমেই শিকার ক'রে বেড়াতে থাকেন। তারপর তাঁরা এই শাখা নদীতে ঢোকেন। তার পরদিনই এই জঙ্গলের মানুষ খেকো বুনো লোকদের নজরে প'ড়ে তাঁরা তাদের হাতে বন্দী হন। বুনোরা তাঁদের সকলকেই আগুনে পুড়িয়ে খেয়ে ফেলে। কেবল অনুচরদের মধ্যে একজন লোক

তাদের হাত এড়িয়ে অতিকষ্টে পালিয়ে যায় ও ইউগ্যাণ্ডায় ফিরে এই ভয়ানক গল্প করে। তারপর অনেক অনুসন্ধান হ'য়েছিল বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সেই বুনোদের বা এই বোটের কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় নি। এতদিন পরে যে বোটখানি আমরা দেখলাম এটি সেই বোট।

শিকারী সাহেবের কথা শুনে আমার তো চক্ষুস্থির। বাপরে! কি ভয়ানক দেশ! এখানে মানুষ এমন হিংস্র! এমন ভয়ঙ্কর! এমন অসভ্য!

বোটখানির পরিচয় পাবার পর আমাদের সকলেরই মনে একটা নতুন প্রশ্ন জেগে উঠ্‌লো। তবে তো সেই নরখাদক অসভ্যেরা নিকটেই কোথাও আছে। পাহাড়ের উপর আমাদের তাঁবু দেখে তাঁরা তো তাঁবু আক্রমন ক'রতে পারে। মাত্র দশজন অনুচরকে আমরা তাঁবু পাহারায় রেখে এসেচি। তাদের কাছে রাইফেল বা কোন মারাত্মক অস্ত্র নেই। শুধু তীর ধনুক আর বর্ষা নিয়ে তারা অসভ্যদের আক্রমণে বাধা দিতে পারবে? শেষে হয়তো তারাও ওই নরখাদকের পেটে যাবে। আর আমাদের তাঁবু, রসদ, সাজ সরঞ্জাম, খাদ্য, ওই বুনোরা দখল ক'রে নেবে। তা হ'লে উপায়?

প্রায় আধঘণ্টা ধ'রে অনেক যুক্তিতর্কের পর স্থির হ'লো যে আমাদের পাঁচজন শিকারীর এক সঙ্গে শিকারে যাবার

প্রয়োজন নেই। আমাদের মধ্যে দুজনকে তাঁবু পাহারার জন্যে ফিরে যেতে হবে। আর এই যে চল্লিশজন অনুচর আমাদের সঙ্গে র'য়েচে, এদেরও শিকারে টেনে নিয়ে যাবার কি দরকার? শিকারের কাজে পাঁচজন হ'লেই যথেষ্ট। বাকি পঁয়ত্রিশ জন কুলী দু-জন শিকারীর সঙ্গে তাঁবুতে ফিরে যাক্।

পরামর্শ মত ইউগ্যাণ্ডার শিকারীদের মধ্যে দু-জন সাহেব কুলীদের নিয়ে তাঁবুতে ফিরে গেলেন। অসভ্যদের উপর তাঁদের ভয়ানক আক্রোশ। তাঁরা এই সুযোগে অসভ্যদের উচিত শিক্ষা দেবার সঙ্কল্প আঁটলেন। আমরা তিন জন শিকারী, অর্থাৎ আমি, আমার সাহেব, আর একজন ইউগ্যাণ্ডার ইংরাজ, পাঁচজন কুলীর সঙ্গে সেই বোটখানি দখল ক'রে ব'সলাম। বোট্‌টিতে চারটি দাঁড় ছিল। চারজন কুলীকে দাঁড়ে বসিয়ে দিয়ে আমরা রাইফেল নিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে রইলাম। যদি বুনোরা আমাদের অনুসরণ করে, তাহ'লে জন্তু জানোয়ারের বদলে তাদের শিকার ক'রেই আমাদের শিকারের সাধ মিটিয়ে নেব।

বোট্ চালিয়ে মাত্র দুশো হাত এগিয়েচি এমন সময় হঠাৎ তীরের দিকে নজর পড়তেই দেখলাম একটা নর রাক্ষস ঝোপের আড়াল হ'তে আমাদের লক্ষ্য ক'রচে। কি অদ্ভুত তার চেহারা! মিস্‌কালো রং, গোল গোল ভাঁটার মত চোখ, লম্বা

মুখ আর উলুখড়ের মত রুক্ষ, ঝাঁক্ড়া চুল। তার সাজসজ্জাও অদ্ভুত। কোমরে কাপড় নেই কিন্তু মাথায় শকুণের পাখার টোপর। গলায় হাড়ের মালা আর হাতে কি সব লতা-পাতার গয়না।

'বুনোটা উঁকি দিয়ে আমাদের গতিবিধি দেখে নিয়ে বোধ হয় তার দলে খবর দেবার জন্যে যাচ্ছিলো। কিন্তু তার সে মতলব আর কাজে পরিণত হ'লো না। ইউগ্যাণ্ডার শিকারী সাহেবটি বোট হ'তেই তাকে লক্ষ্য ক'রে রাইফেল ছাড়লেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় গুঁজড়ে অসভ্যটা ঝোপের মধ্যেই প'ড়ে গেল। আমরাও তাড়াতাড়ি বোট চালিয়ে সুমুখ দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। চারটি দাঁড়ের টানে আমাদের বোট্খানা তর্ তর্ ক'রে চ'লতে লাগলো আর আমরা ব'সে দু'ধারের তীরে নানা জন্তু জানোয়ারের খেলা দেখতে দেখতে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

বোটের দু পাশে নদীর জলে কুমীরেরা দলে দলে ভাসচে। কতকগুলো বোটের পিছনে পিছনে ধাওয়া ক'রচে। কিন্তু চলন্ত বোটের উপর থেকে মানুষ ধ'রে খাওয়া মোটেই সুবিধাজনক নয় ব'লে বিশেষ কিছু ক'রে উঠ্তে পারচে না। মাঝে মাঝে বোটের যাবার পথে এক একটি এমন ভাবে প'ড়তে লাগলো যে বাধ্য হ'য়ে তার উপর দিয়েই বোট্ চালাতে হ'লো।

কুমীরগুলোর দিকে আমাদের লক্ষ্য মোটেই নেই। সঙ্গের পাঁচজন কুলীই তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রতে লাগলো। আমরা তিনজন কেবল বিস্মিত দৃষ্টিতে তীরের উপর জানোয়ার-দের কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগলাম।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। এমন জন্তু জানোয়ারের ঘটা আমি তো কখনও দেখিনি। এক এক স্থানে এক এক রকমের জানোয়ার দলে দলে পালে পালে দেখা যেতে লাগলো।

প্রথমেই চ'খে পড়লো বানরের পাল। সে যে কত রকমের আর কত আকারের বানর তা তোমাদের কি ব'লবো। কোনটা বড়, কোনটা ছোট, কোনটার লম্বা মুখ, কোনটার গোল, সব যেন অদ্ভুত রকমের।

তাদের ডাকও নানা রকমের। তারা আমাদের দেখে ভয় পেয়েছিল। কেন না তারা দলে দলে এক গাছ হ'তে অন্য গাছ, আবার সে গাছ থেকে অন্য গাছে লাফিয়ে ডাকতে ডাকতে দূরে পালাতে লাগলো। কতকগুলো মাটীর উপর দিয়েই লাফাতে লাফাতে ছুটলো। আমরা তাদের দল পার হ'য়ে ক্রমেই এগিয়ে যেতে লাগলাম।

তারপর দেখলাম এক রকমের অদ্ভুত বানর। সাহেব ব'ল্লেন তাদের নাম কেশরী বানর। বাস্তবিক কেশরীই বটে। বানর হ'লেও তাদের দেখলে কেশরী অর্থাৎ সিংহ ব'লেই ভ্রম

হয়। যেমন সিংহের মত মুখ, তেম্নি আবার তাদের ঘাড়ে সিংহেরই মত কেশর। গঠনটাও অনেকটা সিংহের মত। নদীর ধারে মাটীর উপর তারা বেড়াচ্চে। আমাদের দেখে ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, তারা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে আমাদেরই ভয় দেখাতে লাগলো। সাহেব কৌতূহল পরবশ হ'য়ে তাদের একটাকে গুলি ক'রলেন।

এই আর যাবি কোথা? সেটা তখনই ম'লো বটে কিন্তু তাই দেখে দলে দলে কেশরী বানর এসে সেখানে জড় হ'লো। কি তাদের রাগ! কি আস্ফালন! কি দাঁত খিচুনি! বোধ হয় আমাদের পেলে তারা ছিঁড়ে টুকরো ক'রে ফেলে। আমরা যদি বোটে না থাকতুম আর আমাদের আর তাদের মধ্যে যদি নদী না থাকতো, তাহ'লে যে কি হ'তো তা বলা যায় না। এক সঙ্গে একশো কি দেড়শো ক্রুদ্ধ কেশরী বানরের আক্রমণ হ'তে আত্মরক্ষা করা কিছুতেই সম্ভবপর হ'তো না। যাহোক আমরা খুব জোরে দাঁড় টেনে তাদের ছাড়িয়ে চ'লে গেলাম।

তারপরেই চ'খে পড়লো একদল জেব্রা। কি সুন্দর গঠন! কি সুন্দর তাদের রং। ঈষৎ হল্‌দে রঙের উপর লম্বা লম্বা কালো ডোরা, আর গোল গাল হৃষ্টপুষ্ট চেহারা।

আরও কিছু দূর এগিয়ে যেতে একটা প্রকাণ্ড ফাঁকা জায়গা দেখতে পেলাম। তীর হ'তে বহু দূর পর্য্যন্ত শুধু

ফাঁকা। গাছপালা নেই বললেই হয়। দেখলাম দূরে অনেকগুলি হরিণ মনের সুখে চ'রচে। হরিণগুলোকে দেখে শিকার করবার খুব ইচ্ছা হ'লো কিন্তু সেগুলি অনেক দূরে আছে বুঝে আমরা সে আশা ত্যাগ ক'রলাম! কারণ এ রকম ফাঁকা জায়গায় হরিণের পিছনে তাড়া ক'রে শিকার করা অসম্ভব। আমাদের একটু সাড়া পেলে নিমেষে তারা যে হাওয়ার মত কোথায় মিশিয়ে যাবে তা বলা যায় না। অগত্যা আমরা আরও এগিয়ে চ'ল্লাম।

কিছু দূর যেতেই ফাঁকা উপত্যাকাটি শেষ হয়ে আরম্ভ হ'লো পাতলা জঙ্গল। ছোট ছোট ঝোপ আর মধ্যে মধ্যে, এক একটি বড় গাছ। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কোনো জানোয়ারই আমাদের চ'খে প'ড়লো না। আমরা আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম। এতখানি স্থান জানোয়ার শূন্য থাকার কারণ কি ?

হঠাৎ একটা বিকট গর্জ্জন শোনা গেল। সাহেব দুজন চ'মকে উঠে ব'ল্লেন "সিংহ সিংহ।" আমরা বোটের উপর উঠে দাঁড়িয়ে তীরের দিকে চেয়ে দেখলাম হ্যাঁ সিংহই বটে। তীর হ'তে প্রায় চারশো হাত দূরে একটা প্রকাণ্ড সিংহ, মরা একটা হরিণের বুকের উপর ব'সে গর্জ্জন ক'রচে।

আমরা বোটের উপর দাঁড়িয়ে কেমন ক'রে সিংহ মহারাজকে শিকার করা যায় সেই সম্বন্ধে যুক্তি আঁটচি এমন সময় আর

শিকারটির কাছে দুই পশুরাজের মহাসমর বেধে গেল

একটা সিংহকে বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম। পরক্ষণেই হরিণটির জন্যে দুই পশুরাজের মহাসমর বেধে গেল।

সাহেবরা আর অপেক্ষা ক'রতে চাইলেন না। এক সঙ্গে দুটী সিংহ শিকারের লোভ কি ছাড়া যায়? তাঁরা দুজন তীরে নেমে প'ড়লেন। কুলীদের মধ্যে মাত্র একজন তাঁদের সঙ্গে গেল। অবশিষ্ট চারজন কুলীর সঙ্গে আমি বোটের উপর দাঁড়িয়ে রইলাম।

ঘাসের আড়ালে গুড়ি মেরে প্রায় দুশো হাত এগুবার পর দুজন শিকারী মাটীতে হাঁটু গেড়ে বসলেন। সিংহ দুটি তখনো সমান ভাবে যুদ্ধ করচে।

সাহেব দুজন রাইফেল তুলে ধ'রে তাগ্ ক'রতে লাগলেন। তারপর এক সঙ্গে দুজনেরই রাইফেল গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌লো। একটি সিংহ তৎক্ষণাৎ মাটিতে শুয়ে প'ড়লো। কিন্তু অপরটির আঘাত বোধ হয় তেমন গুরুতর হয়নি। সে একবারে আকাশ ফাটা গর্জ্জন ক'রে তীরবেগে সাহেবদের দিকে তেড়ে এল। তার সে সময়ের সেই মূর্ত্তি, সেই দাঁত খিঁচুনি, আর সেই গর্জ্জন দেখে বোটের উপর হ'তেই আমার বুক গুর গুর ক'রে সারা গায়ে ঘাম বেরুতে লাগলো। মনে করলাম সাহেবদের আর রক্ষা নেই। কিন্তু তাঁদের ভাগ্য ভাল তাই আর একটা গুলি তার

মাথায় বিঁধতেই সিংহটা অর্দ্ধেক পথে ঘাড় গুঁজে প'ড়ে মরে গেল।

এক সঙ্গে দুটো সিংহ শিকার। এ সৌভাগ্য সহজে সকলের ভাগ্যে মেলে না। আমরা সকলেই মহা খুসী হ'লাম। সিংহদুটিকে বোটে তুলে নিয়ে আমরা আবার সুমুখ দিকে অগ্রসর হলাম।

কিছু দূর যাবার পর আমাদের দক্ষিণ ধারে এই শাখা নদীর আর একটী উপশাখা দেখতে পেলাম। শাখাটি খুব অল্প পরিসর। আমরা বোটে দাঁড়িয়ে গলা উঁচু ক'রে দেখলাম প্রায় পাঁচশো হাত দূরে একদল জিরাফ চ'রে বেড়াচ্চে। সাহেব ব'ল্লেন "যে অঞ্চলে জিরাফ থাকে, সেই স্থানই শিকারের পক্ষে খুব উপযুক্ত।" অগত্যা সেই খানেই বোট ছেড়ে তীরে ওঠবার মতলব করা গেল। তারপর সেই ত্রিমহনার মুখে, আমাদের বোট্‌টিকে বেশ করে বেঁধে রেখে, আমরা সদলবলে বরাবর জঙ্গলের দিকে এগুতে লাগলাম।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা সেই জঙ্গলটিতে গিয়ে ঢুকলাম। জঙ্গলটি দূর হ'তে যত ঘন ব'লে বোধ হয়েছিল, বাস্তবিক সেটি তত ঘন নয়। দশ পনের বিশ হাত অন্তর এক একটি প্রকাণ্ড গাছ আর তার মাঝে মাঝে দু চারটি গুল্ম। সেখানকার জমী মোটেই সমতল নয়। খুবই উঁচু নিচু আর স্যাঁতসেঁতে।

হাতীগুলোর হাত হ'তে নিষ্কৃতি লাভ ক'রলেও আমাদের বিপদ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'তে পারলাম না। কারণ দূর পানে চেয়ে দেখলাম আরও আট দশটা হাতী এই দিকে ছুটে আসচে। তাদের দুটোর শুঁড়ে দুজন হতভাগ্য কুলীর মৃতদেহ বিজয় নিশানের মত উঁচুতে তুলে ধ'রেচে।

ভাবলাম! নাঃ—এখানে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়।

বেগতিক বুঝে আমরা আর না দাঁড়িয়ে কেবলই ছুটতে লাগলাম। খালের এপাশে জঙ্গল বিশেষ গভীর নয়। সুমুখেই একটা খুব লম্বা জলা দেখলাম। আমরা সেই জলার তীর ধরে ছুটলাম।

জলার এক স্থানে প্রায় পঞ্চাশটি বুনো মহিষ জলে গা ডুবিয়ে বসেছিল। তাই প্রথমটা আমরা তাদের দেখতে পাইনি। মহিষগুলো কিন্তু আমাদের দেখে এক সঙ্গে ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে উঠ্‌লো।

দেখলাম—মহামুস্কিল। হাতীর হাত থেকে যদি বা বাঁচলুম, এবার বুঝি আবার বুনো মহিষের হাতেই প'ড়তে হয়।

মহিষেরা বড় সাধারণ জীব নয়। এরা যখন দলে থাকে, তখন সিংহ বা বাঘ, কোন পশুই এদের কাছে আসতে সাহস করে না। এদের আবার একতা খুব। একটা মহিষ যদি তাড়া করে, তাহ'লে দলের সবগুলিই তাই করবে। এক সঙ্গে

এতগুলি মহিষে তাড়া ক'রলে গেচি আর কি! কাজেই আবার উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে হ'লো।

মহিষগুলো আমাদের তাড়া ক'রলে না বটে কিন্তু তবু আমাদের বিপদ কাটলো না। আমরা জলার তীর বেয়েই ছুটছিলাম, কিছু দূর যেতেই তিনটি জলহস্তি দূর থেকে আমাদের ছুট্‌তে দেখে তাড়া ক'রলে।

তাদের প্রকাণ্ড আকার দেখে আমাদের আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে গেল। তবু সাহসে ভর ক'রে সাহেব তাদের একটাকে গুলি ক'রলেন। গুলিটা তার খুতনিতে গিয়ে লাগতেই সে একটা ভয়ানক আওয়াজ ছাড়লে। তারপর তারা তিনটিতে মিলে আমাদের দিকে তেড়ে আসতে লাগলো।

- আর গুলি চালাবার অবসর পাওয়া গেল না। জলহস্তি-গুলো এমন বেগে ছুটে আসচে যে একটাকে গুলি করবার সঙ্গে সঙ্গে আর দুটো ঘাড়ে এসে প'ড়বে। কাজেই গুলি করার চিন্তা ছেড়ে দিয়ে আমরা ছুট্‌তে লাগলাম।

কি মুস্কিলেই পড়েচি। শিকার ক'রতে এসে এমন মুস্কিলে বোধ হয় কেউ কখনো পড়েনি। বিপদের উপর বিপদ স্থির হ'য়ে একটু দাঁড়িয়ে বিচার ক'রবো, তার অবসর নেই।

ক্রমাগত ছুটতেই হচ্চে। কিন্তু আর ছোটা সম্ভব নয়। আমাদের দম্ ফুরিয়ে এসেচে। পা দুটো বেজায় ভারী হ'য়ে উঠেচে। শরীরও যেন ঝিম্ ঝিম্ ক'রচে। বুঝি মাথা ঘুরেই প'ড়ে যাই। তা হ'লেই আর কি ? একবারে দফারফা।

সাহেব ব'ল্লেন "ওহে ! চলো একটা গাছে উঠি। নইলে রক্ষা পাওয়া ভার।" তিনি একটা প্রকাণ্ড গাছের দিকে ছুটলেন। আমিও তাঁর পাছু নিলাম। তিন মিনিটের মধ্যেই আমরা গাছের তলায় এসে হাজির।

পাশাপাশি দুইটি প্রকাণ্ড গাছ। আমরা তার একটিতে তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়লাম। উঠতে উঠ্তেই জলহস্তিগুলো তার তলায় এসে পড়ল।

জলহস্তিগুলোর দাপাদাপি শুনতে শুনতে আমরা উপরে উঠ্তে লাগলাম। তারপর সুবিধা মত একটা মোটা ডাল পেয়ে আমরা দুজনে তার উপরে ব'সলাম।

তখন দুজনেই বেদম্ হাঁপাচ্চি। ভাবলুম একটু দম্ ঠিক ক'রে নি। তারপর জানোয়ার গুলোর দফা শেষ ক'রবো। যখন গাছে উঠেচি, তখন আর ভয় কি ?

কিন্তু ভাগ্যটা আমাদের খুবই খারাপ ছিলো। তাই নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করা আর ঘ'টে উঠলো না।

হঠাৎ দূর হতে ঢাক ঢোলের শব্দ আর হৈ হৈ

চিৎকার শুনতে পেলাম। যেন অনেকগুলো লোক ঢোল বাজাতে বাজাতে এই দিকে আসচে। আমি মানুষের সমাগম আশা ক'রে আনন্দ প্রকাশ ক'রতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সাহেবের মুখ শুকিয়ে একবারে এতটুকু হ'য়ে গেল। আমি তার কারণ বুঝতে না পেরে তাঁর মুখের পানে চাইতেই তিনি চুপি চুপি ব'ল্লেন—"Savages" অর্থাৎ নরখাদক অসভ্যেরা। শুনে আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে প'ড়লো। এই নানা বিপদ, তার উপর আবার রাক্ষস ? তবে আর বাঁচবার কোনো আশা নেই।

গোলমাল ক্রমেই নিকটে আসতে লাগলো। দেখলাম নীচে জলহস্তীগুলো সেই গোলমালের শব্দ শুনে পালিয়ে গেল।

তাদের পালাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় পঞ্চাশজন নরখাদক অসভ্য ঢাক ঢোল বাজাতে বাজাতে সেখানে এসে হাজির। তাদের আকার দেখেই আমাদের চক্ষুস্থির। মাথায় এক এক রাশ রুক্ষ ঝাঁকড়া চুল, তা আবার লতা দিয়ে ঝুঁটি ক'রে বাঁধা। গলায়, হাতে, কোমরে হাড়ের মালা আর গয়না : কারও কারও গলায় মানুষের মড়ার মাথা। কোমরে কাপড় নেই। একদম উলঙ্গ। হাতে তীর, ধনুক, বর্ষা, আর বাঁশের অস্ত্র শস্ত্র। তাদের গায়ের রঙের কাছে

আল্‌কাতরাও হার মেনে যায়। গোল গোল ভাঁটার মত চোখ, থ্যাবড়ানো চওড়া নাক, ওল্টানো বেজায় পুরু ঠোঁট্। তার উপর আবার তাদের প্রত্যেকের মাথায় শকুন আর চিলের পাখার ঘেরাটোপ্।

তারা সব হৈ হৈ ক'রতে ক'রতে গাছের তলায় এসেই উপর পানে চেয়ে আমাদের দুজনকে দেখে ফেল্লে। বুঝলাম এইবার সত্য সত্যই আমাদের শেষ।

অসভ্যদের যে সর্দ্দার তার চেহারা আরো বিশ্রী। তাকে দেখলে সত্যই রাক্ষস বলে মনে হয়। তার গলায় একটা মড়ার আস্ত মাথা ঝুলচে, আর মাথায় কোমরে শকুণের পালকের কি ঘটা! সে একটা কি অবোধ্য ভাষায় হুকুম ক'রলে আর সঙ্গে সঙ্গে দুজন লোক বর্ষা নিয়ে গাছের উপর উঠ্‌তে লাগলো! আরও কয়েকজন ধনুকে তীর পরিয়ে আমাদের দিকে তাগ ক'রতে লাগলো। ভাবলুম বুঝি মেরে ফেল্লে। কিন্তু তারা তীর ছাড়লে না। শুধু আমাদের ভয় দেখাবার জন্যে তীর উঁচু ক'রে ধ'রে রইলো।

আমাদের দুজনকে গাছ্ হ'তে নামিয়ে নিয়ে ফিরে যাবার সময় তারা পূর্ব্বের মত ঢোল বাজাতে বাজাতে চল্‌তে লাগলো। আমরা বলিদানের ছাগলের মত কাঁপতে কাঁপতে তাদের সঙ্গে চল্লাম।

অসভ্য নরখাদকেরা যখন আমাদের ধ'রে নিয়ে চল্লো— তখন আমাদের পরিণাম যে কি হ'তে পারে তা বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। তারা আমাদের জীবন্ত অবস্থায় আগুনে পুড়িয়ে আমাদের গায়ের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে তা বুঝেও আমরা জীবনের আশা ছাড়ি নি। উপস্থিত কোন কিছু ক'রতে গেলে বিপদ আরও সুনিশ্চিত জেনে আমরা শুধু উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করছিলাম। সুযোগ পেলেই আমরা আত্মরক্ষার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রবো, এ কথা আমরা ভেবে রেখেছিলাম! কাছে যতক্ষণ রাইফেল আছে ততক্ষণ কিসের ভয়? আর যদি নিতান্তই ম'রতে হয় তা হ'লে কাপুরুষের মত ম'রব না নিশ্চয়। রাক্ষসদের সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ ক'রতে ক'রতে মানুষের মতই ম'রবো।

কলের পুতুলের মত নরখাদকদের সঙ্গে যাচ্চি। মাঝে মাঝে সাহেবের সঙ্গে দু'একটা কথা ক'য়ে যুক্তি আঁটচি। বুনোরা আমাদের ভাষা বোঝে না। কাজেই কোন অসুবিধা নেই। তবে মাঝে মাঝে দু'একজন অসভ্য আমাদের পিঠে দু'একটা গুঁতো মেরে চালিয়ে নিয়ে যাচ্চে। এম্নি ক'রে অনেক বন জঙ্গল ভেঙে তারা আমাদের নিয়ে গেল তাদের ডেরায়।

আমরা যখন সেখানে পৌঁছুলাম তখন কতকগুলি অসভ্য

নর ও নারী উঠানে জটলা পাকাচ্ছিল। আমাদের দুজনকে দেখে তাদের কি আনন্দ !

নারীদের মধ্যে দুতিন জন আমাদের গা টিপে দেখতে লাগলো যে আমাদের গায়ে কতখানি মাংস আছে, আর তা নরম কি শক্ত। তারপর তারা হি হি হি হি ক'রে অট্টহাসি হাসতে লাগলো।

গায়ের রক্ত যেন জল হয়ে গেল। বাপরে! কি ভয়ানক তাদের চেহারা! আর কি বিকট হাসি!

কজন রাক্ষস আর রাক্ষসী মিলে আমাদের একটা কুঁড়ের সুমুখে জোর করে বসালে। তারপর দশ বারো জন রাক্ষস আমাদের ঘিরে ব'সলো। ঠিক পিছনেই একটা উঁচু পাথরের উপর সর্দ্দার রাক্ষসটা ব'সে পড়লো। আমাদের পাশেই দুটো প্রকাণ্ড জন্তু আগুনে পোড়া হ'চ্ছিলো। তারা সে দুটোকে খণ্ড খণ্ড ক'রে কেটে মহা আনন্দে খেতে লাগলো।

খাওয়ার পর নাচ। উঠানের মাঝখানে রাক্ষস রাক্ষসী সবাই মিলে ঢোল মাদল বাজিয়ে তাণ্ডব নৃত্য লাগিয়ে দিলে। তাদের সেই অদ্ভুত নৃত্য, আর মধ্যে মধ্যে রে রে—হৈ হৈ শব্দ, শুনে আমাদের তাক্ লেগে গেল।

আমরা যেখানে বসে নাচ দেখছি তার চার পাশে দশ বারো জন আমাদের ঘিরে বসে আছে। আমাদের দিকে তাদের কড়া

আগুনে দুটো প্রকাণ্ড জন্তু পুড়ছিল।

নজর। কাজেই কোন কিছু করবার সুযোগ পাচ্চি না। কিন্তু যা হয় একটা কিছু ক'রতে হবে। নইলে আমাদের দশা যে কি হবে তা বুঝতেই পারচি।

সর্দ্দার রাক্ষসটা আমাদের পিছনে ব'সে আছে। সে কেবল মাঝে মাঝে কটমট ক'রে আমাদের দিকে চাইচে, আর আমাদের গলা শুকিয়ে উঠ্‌চে। মনে হচ্চে বুঝি এখনই আমাদের খেয়ে ফেলে। তবু আমরা চুপ ক'রে ব'সে উদ্ধারের উপায় চিন্তা করচি।

হঠাৎ এক বেটা রাক্ষস কৌতূহল পরবশ হ'য়ে আমার হাত থেকে রাইফেলটা কেড়ে নিলে। সেটা যে কি জিনিস তা সে জানে না। শুধু সে কেন? তাদের কেউই জানে না যে এটা কতো বড় মারাত্মক অস্ত্র। তাই সে রাইফেলটা নিয়ে নেড়ে চেড়ে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেটা দেখতে লাগলো।

রাইফেলের নলটা সর্দ্দার রাক্ষসটার দিকে ফেরানো ছিল। সর্দ্দারটাও কৌতুহলের সঙ্গে রাইফেলটার দিকে চেয়েছিল। রাক্ষসটা এটা ওটা নাড়তে নাড়তে খট্ ক'রে ঘোড়াটা তুলে ফেল্লে। তারপর ক্রমে ক্রমে এটা সেটায় হাত দিতে দিতে হঠাৎ ট্রিগারটা ধ'রে টান দিলে।

আর যাবি কোথা? রাইফেলে গুলি ভরা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ হ'য়ে একেবারে গুলি গিয়ে বিধলো সর্দ্দার বেটার বুকে।

এই আকস্মিক ব্যাপারে সকলে মহা ভয় পেয়ে গেল। যে বেটা রাইফেল ঘাঁটছিলো সে তো চমকে উঠে রাইফেলটা আমার কোলে ফেলে দিয়ে ছুটে বাইরে পালিয়ে গেল। সকলে বোধ হয় ভাবলে যে এটা একটা বাজ। নইলে হঠাৎ আগুনের হল্কা আর এমন শব্দ হয়? আর তাইতে সর্দ্দার তখনি ম'রে যায়? তারা প্রথমটা থতমত খেয়ে গেল। তারপর সকলে মিলে সেই লোকটাকে ধ'রে টানাটানি ক'রতে লাগলো, যে বাজ টেনে এনে সর্দ্দারকে মেরে ফেলেচে। একটা মহা হৈ চৈ প'ড়ে গেল। সবাই উঠানের মাঝখানে জমা হ'য়ে সেই লোকটাকে ধ'রে বেদম ঠেঙাতে সুরু করে দিলে।

আমরা দেখলাম এই মহা সুযোগ। আমাদের দিকে তাদের তখন লক্ষ্য নেই। তারা সেই লোকটাকে নিয়েই ব্যস্ত হ'য়ে পড়েচে। সর্দ্দারকে হত্যা করবার প্রতিশোধ নিতেই তারা উন্মত্ত। অবসর বুঝে আমরা রাইফেল দুটো হাতে নিয়ে কুঁড়ের পাশ দিয়ে স'রে পড়লাম। তারপর দুজনে বন জঙ্গল ভেঙে, পড়ি কি মরি ক'রতে ক'রতে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটলাম।

চারশো হাত যেতে না যেতেই পিছনে শুনলাম অসভ্য বেটাদের গোলমাল। তারা সকলে দল বেঁধে তীর, ধনুক, নিয়ে আমাদের দিকে আসচে। আমরা তো কোনও দিকে না চেয়ে প্রাণপণ শক্তিতে ছুটতে লাগলাম।

অসভ্যেরা পিছন হ'তে তীর ছুঁড়তে লাগলো। ছ'একটা তীর আমার কাণের পাশ দিয়ে সোঁ সোঁ ক'রে বেরিয়ে গেল। সাহেবের হাতের রাইফেলটির কুঁদোতে ঠক্ ক'রে একটা তীর এসে লাগলো। আর একটু হ'লেই সাহেবকে বিঁধেছিল আর কি! সে তীর গায়ে বিঁধলে কি আর রক্ষা ছিলো? তীরের ফলায় বিষ মাখানো। সে বিষ রক্তের সঙ্গে মিশলে মৃত্যু সুনিশ্চয়। দেখলাম ব্যাপার বড় সুবিধার নয়। এমনভাবে ছুট্‌লে রাক্ষসদের হাত হ'তে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন। আমরা একটা আশ্রয়ের আশায় চারিদিকে চাইতে চাইতে চল্‌তে লাগলাম।

পথের একটু দক্ষিণে একটা প্রকাণ্ড পাথর প'ড়েছিল। পাথরটা হাত দুই উঁচু আর প্রায় পাঁচ হাত লম্বা। তার পিছনে গুঁড়ি মেরে বেশ আত্মগোপন করা যেতে পারে। আমরা কালবিলম্ব না ক'রে তার আড়ালে গিয়ে ব'সলাম। তারপর পাথরটার উপর রাইফেলের নল দুটি রেখে অসভ্য বেটাদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে দিলাম।

গুড়ুম, গুড়ুম, গুম্ আমাদের রাইফেল গজরাতে লাগলো আর দূরে, এক একটা রাক্ষস ছুটতে ছুটতে ঘুরে মাটীতে মুখ থুবড়ে প'ড়তে লাগলো। তাদের তীরগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পাথরটার উপর বা আশে পাশে প'ড়তে

লাগলো। কোনটা বা আমাদের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। সেদিকে আমাদের ভ্রুক্ষেপ নেই। আমরা কেবল অবিশ্রাম গুলি চালাতে সুরু করলাম।

রাক্ষসদেরও জেদ কম নয়। দলের লোক কতক-গুলো ম'রলো দেখেও প্রথমটা তারা ভয় পেলে না। আমাদের ঘাড়ে এসে পড়বার চেষ্টা করতে লাগলো। আমরা তখন মরিয়া। শেষে যা হয় হবে। রাক্ষস মেরে তবে কাজ। সত্য কথা বলতে কি আমার তো তখন রক্ত গরম হয়ে উঠেচে। নিজের মরণ বাঁচনের কথা তখন আর মনে নেই। কেবল মার্, শত্রু মার্।

রাইফেলের ধোঁয়ায় যেন কুয়াশার সৃষ্টি হ'য়ে গেল। যে রাক্ষসগুলো এগিয়ে আসছিলো তারা মাটীতে গড়াগড়ি দিতে লাগলো।

তখন রাক্ষসেরা তাদের অবস্থা বুঝতে পারলে। এ রকম ভাবে আর কিছুক্ষণ যুদ্ধ চ'ল্‌লে তাদের প্রকাণ্ড দলের একটা প্রাণিও যে বেঁচে থাকবে না, তা তারা বেশ বুঝে নিলে। তখন যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে তারা পালাতে সুরু করলে।

আমি আর ধৈর্য্য রাখতে পারলাম না। এত বড় একটা যুদ্ধ জয় ক'রে আমার শরীর আগুন হ'য়ে গিয়েচে। রাক্ষসদের পালাতে দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। পাথরের

আড়াল হ'তে ছুটে বেড়িয়ে মার্ মার্ বলতে বলতে তাদের পিছনে তাড়া ক'রলাম। সাহেব আমাকে তেমন কাজ ক'রতে নিষেধ ক'রলেন! সে কথা আমার কাণে গেল না। আমি রাক্ষসদের পিছনে ছুট্তে লাগলাম।

ফাঁকা জায়গায় আমাকে একা এগুতে দেখে হঠাৎ অসভ্যেরা আমার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে প্রতিশোধ নেবার আশায় আমার উপর ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছাড়তে লাগলো। বিশটা তীর আমার সুমুখে আর আশে পাশে এসে প'ড়লো আর দু তিনটে কাণের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সাহেব পিছন পিছন ছুটে আসতে আসতে চেঁচিয়ে ব'ল্লেন—"শুয়ে পড়ো, শীগ্গির শুয়ে প'ড়ো।" আমি আর এক সেকেণ্ড দেরী না ক'রে, ধপ্ ক'রে মাটীতে উপুড় হ'য়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো বীষাক্ত তীর আমার উপর দিয়ে সাঁ সাঁ ক'রে ছুটে চ'লে গেলো।

ঠিক সেই সময়ে আমার পিছনে হাঁটু গেড়ে ব'সে সাহেব গুলি চালাতে লাগলেন! আমিও শুয়ে শুয়ে গুলি ক'রলাম। দেখতে দেখতে আরও তিন চারটে বুনো সাবাড় হ'লো। তখন নিতান্ত বেগতিক বুঝে আক্রমণের সব আশা ছেড়ে দিয়ে, বুনোরা প্রাণ ভয়ে যে যে দিকে পারলে গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

সাহেব আমাকে একচোট খুব ধম্‌কালেন। নিজের আশ্রয় ছেড়ে দিয়ে অসভ্যদের সুমুখে এমন আহাম্মুকের মত দৌড়ে আসা আমার পক্ষে যে খুবই মূর্খতার কাজ হ'য়েচে তা তিনি আমায় বুঝিয়ে দিলেন। আমিও তা বুঝে খুব অপ্রস্তুত হ'য়ে গেলাম।

যুদ্ধ জয় হ'য়ে গেল। কিন্তু আমাদের সমস্যা যেমন তেম্নিই র'য়ে গেল। আমরা এসেচি কোথায়-কতদূরে, তার ঠিক নেই। কোন দিকে আমাদের তাঁবু, কোন দিকে বোট্ তা কিছুই ঠিক ক'রতে পারচি না।

এখন উপায় ? আফ্রিকার জঙ্গল। সাক্ষাৎ যমের রাজত্ব। পদে পদে একটা না একটা জানোয়ারের সুমুখে পড়ার ভয়। নরখাদক অসভ্যদের তো কথাই নেই।

সুমুখে রাত আসচে। একটি পা বাড়াবার উপায় থাকবে না। পা বাড়ালেই মরণ সুনিশ্চয়। এখানে জলে, স্থলে, গাছে, কোথাও আশ্রয় নেই। কোন স্থানই নিরাপদ নয়।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব কথা ভাবচি এমন সময় সাহেব ব'ল্লেন—"দেখ, এমন ক'রে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে ফল নেই। এসো একটা কাজ করা যাক্।

আমি হিসাব ক'রে দেখলাম যে আমরা আমাদের তাঁবু হ'তে

বরাবর দক্ষিণ পশ্চিমে এসেচি। বোট্ হ'তে আমরা এসেচি পশ্চিমে। আর বোটের কাছ হ'তে আমরা যে খুব বেশী দূর এসেচি তা নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এখান হ'তে বরাবর পূর্ব্বে আন্দাজ তিন চার মাইলের মধ্যে আমাদের বোট্ আছে। যদি ক্রমাগত পূব দিকে ছুট্‌তে থাকি তা হ'লে বড় জোর এক ঘণ্টার মধ্যে বোটের কাছে পৌঁছুতে পারবো।

এখন বেলা চারটে। সন্ধ্যা হ'তে এখনও দেড় ঘণ্টা বিলম্ব আছে। তা'হলে হয়তো সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা বোটে পৌঁছুতে পারি। না পারি, তাতেই বা ক্ষতি কি? এখানেও যে অবস্থা, সেখানেও তাই। তবু তো মানুষের মত চেষ্টা করা হবে?"

সাহেবের কথা আমার খুব মনে লাগলো। ঠিকই তো। চেষ্টা ক'রতে ক্ষতি কি? এখানে দাঁড়িয়ে মরার চেয়ে চেষ্টা ক'রতে ক'রতে মরা ঢের ভালো।

আমরা আর সময় নষ্ট ক'রলাম না। বন জঙ্গল ভেঙে বরাবর পূর্ব্ব দিক লক্ষ্য ক'রে ছুট্‌তে লাগলাম।

কিছুদূর যাবার পর একটা ভয়ানক শব্দ আমাদের কাণে গেল। সে কি ভীষণ আওয়াজ! চারিদিকের বন-জঙ্গল যেন সেই শব্দে কাঁপতে লাগলো। আমরাও ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে গেলাম। আমাদের পা দুটো এমন ভারী হ'য়ে গেল যে আমরা যেন আর তাদের তুলতে পারছিলাম না। সভয়ে

চারিদিকে চাইতে চাইতে একটুখানি এগিয়ে যেতেই সেই শব্দের কারণ আমাদের চ'খে প'ড়ে গেল। কি ভয়ানক ব্যাপার !

সেই স্থান হ'তে তিনশো হাত দূরে একটা জলা। তার তীরে একটা প্রকাণ্ড সিংহের সঙ্গে একদল বুনো মোষের ভয়ানক লড়াই বেধে গিয়েচে। বুঝলাম সিংহ মহারাজ বোধহয় পেটের জ্বালায় তাদের মধ্যে একটাকে আক্রমন ক'রেছিলেন। তার ফলেই এই যুদ্ধ।

দেখলাম বুনো মোষেরা রেগে আগুন হ'য়ে ভীষণ ফোঁস ফোঁস শব্দ ক'রতে ক'রতে ঘাড় নিচু ক'রে চারিদিক হ'তে সিংহকে আক্রমণ করচে, আর সিংহটাও মেঘ গর্জ্জনের মত আওয়াজ ছাড়তে ছাড়তে ভীষণ থাবা আর দাঁতের সাহায্যে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রচে। দু পক্ষেরই সমান জেদ। কোন পক্ষই হার মানতে প্রস্তুত নয়। তাদের ভীষণ দাপাদাপি আর গর্জ্জনে জঙ্গলের সে অঞ্চলটা একবারে মুখরিত হ'য়ে উঠেচে।

দৃশ্যটা লোমহর্ষণকর হ'লেও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখবার কৌতুহল দমন ক'রতে পারলাম না। সিংহের থাবায় এক এক ক'রে পাঁচ ছ'টা মোষ ধরাশায়ী হ'লো। কিন্তু দুর্দ্দান্ত মোষেরা তাতে ভয় পেলে না। তারা আরও উন্মত্ত হ'য়ে

বাঁকা বাঁকা সিংএর সাহায্যে পশুরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলো। ক্রমে সিংহ মহারাজ ভয়ানক ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়লেন। তাঁর আস্ফালন আর গর্জ্জন ক্রমেই ক্ষীণ হ'য়ে আসতে লাগলো। তবুও সেই অবস্থায় তিনি আরও তিন চারটে শত্রুকে নিহত ক'রলেন। তারপর বীরের মত ক্ষিপ্ত মোষদের সিংএর গুঁতোয় পঞ্চত্ব লাভ ক'রলেন।

আমরা তো ভয়ে একটা ঘাসের ঝোপের আড়ালে লুকোবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমাদের সে উদ্দশ্যে সফল হ'লো না। একটা মহিষ আমাদের দেখে ফেল্লে। বিষম বেগতিক দেখে আমরাও পড়ি কি মরি করতে করতে খালের ধারের সেই গাছটার দিকে ছুট্‌লুম।

গাছটার প্রায় বিশ হাতের মধ্যে এসেচি এমন সময় পিছনে ভীষণ ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনে ফিরে দেখলাম দুটো মহিষ আমাদের ঠিক পিছনেই এসে প'ড়েচে। নিরুপায় হয়ে তাড়াতাড়ি সে দুটোকে গুলি ক'রলাম। তারপর আবার ছুট।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই গাছটার তলায় পোঁছে লাফ দিয়ে ঝুরিটা ধ'রে ওপারে লাফিয়ে পড়লাম। এপারে এসে আর অপেক্ষা ক'রতে পারলাম না।

এখনো আমাদের সুমুখে অনেক পথ প'ড়ে র'য়েচে।

দুই শাখার সংযোগ স্থলে ত্রিমহনার মুখে আমাদের বোট্ রেখে এসেচি। সেস্থান এখনও দেড় মাইল দূরে।

এদিকে সন্ধ্যা এসে প'ড়েচে। এখনই গাঢ় অন্ধকার হ'য়ে প'ড়বে। তখন আর পথ চিনে চ'লতে পারবো না।

অগত্যা আমরা আবার পূর্ব্বের মত ছুট্‌তে লাগলাম।

বিশ মিনিটের মধ্যেই ত্রিমহনার খুব কাছে এসে একটু দূরে তিনজন লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। নিকটে যেতেই চিনলাম তাদের মধ্যে একজন আমাদের শিকার-সঙ্গী ভ্যাণ্ডার সাহেব, আর দুজন আমাদের কুলী। তিনি প্রায় আধঘণ্টা পূর্ব্বে সেখানে হাজির হয়েচেন। কিন্তু আমাদের এখানে না পেয়ে বোটে ওঠেন নি।

শুনলাম বুনো হাতীর দল তিনজন কুলীকে ধ'রে একবারে মাংসের তাল ক'রে ফেলেচে। সাহেব, আর এই দুজন কুলীকেও তারা ধ'রে ফেলতো যদি না তাঁরা একটা জানোয়ার ধরা গর্ত্তের মধ্যে প'ড়ে যেতেন।

এ অঞ্চলের অসভ্যেরাই বোধ হয় সেই গর্ত্ত কেটে রেখেছিল। গর্ত্তটি লম্বা ৫ হাত, চওড়ায় প্রায় হাত তিন। আর সেটা গভীর প্রায় আট হাত। গর্ত্তটির চারিপাশ হ'তে লম্বা লম্বা ঘাস গজিয়ে গর্ত্তটিকে একবারে ঢেকে ফেলেছিল। উপর হ'তে বোঝবার কোনও উপায় ছিল না।

এঁরা তিনজনে ছুটতে ছুটতে হুড়মুড় করে তার মধ্যে প'ড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে ঘাসগুলো যেমন গর্ত্তটিকে ঢেকে রেখেছিল, তেমনি ঢেকে ফেলে। হাতীগুলো তাঁদের আর দেখতে না পেয়ে অন্যদিকে চ'লে যায়। তিন চার ঘণ্টা তাঁরা হাতীদের ভয়ে সেই গর্ত্তের মধ্যেই লুকিয়ে থাকেন। তারপর অনেক কষ্টে, উপরে উঠে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এখানে এসেচেন। সাহেবের ডান পাটি খুবই জখম হয়েচে। বোধ হয় সেটা কেটে বাদ দিতেই হয়।

যা হোক আর বিলম্ব না ক'রে আমরা বোটের কাছে গেলাম। দেখলাম দুটো প্রকাণ্ড কুমীর তার ভিতর মজা ক'রে শুয়ে র'য়েচে। রীতিমত খোঁচা দিতে তবে তারা বোট্ ছেড়ে জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়লো। আমাদের শিকার করা সিংহ দুটি বোটে নেই। কুমীর মশায়দের পেটে চ'লে গিয়েচে।

বোট্ নিয়ে তাড়াতাড়ি আমরা বেরিয়ে প'ড়লাম। তখন রীতিমত অন্ধকার। তিন ঘণ্টা পরে আমরা তাঁবুর কাছে এলাম। বোটে বসে পাঁচ-ছ বার রাইফেলের আওয়াজ ক'রবার পর তাঁবু হ'তে একদল কুলী আর দুজন সাহেব অনেকগুলো জ্বলন্ত মশাল নিয়ে নদীর তীরে নেমে এলেন। তাঁদের সঙ্গে আমরা তাঁবুতে চ'ল্‌লাম।

তাঁবুতে এসে শুনলাম প্রায় বিশ পঁচিশটা নরখাদক অসভ্য তাঁবু আক্রমণ ক'রেছিলো কিন্তু সাহেব দু'জনের গুলি খেয়ে তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ আশপাশেই প'ড়ে আছে। মাত্র তিন চারজন প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেচে।

সে রাত্রে আর অধিক আলাপ করা গেল না। আমরা সবাই ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছিলাম। কোন রকমে কিছু খেয়ে নিয়ে শুয়ে প'ড়লাম।

ভোরে উঠে সকলে মিলে নরখাদকদের মৃতদেহ গুলো দেখতে গেলাম। তাঁবুর নিকটে ও কিছু দূরে কুড়িটা মৃতদেহ পড়েছিল।

নরখাদক অসভ্যদের মৃত্যু দেখে আমাদের খুব আনন্দ হ'লো। তারপর আমরা তাঁবুতে ফিরে এলাম। এবারের মত আমরা সকলেই খুব ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম। তাই আর শিকারের চেষ্টা না ক'রে ইউগ্যাণ্ডায় ফিরে যাবার মতলব করলাম।

সাহেব বল্লেন, "এসব জন্তু শিকারে তেমন মজা নেই। শিকার যদি ক'রতে হয় তো গরিলা। গরিলার মত ভয়ঙ্কর জীব আর পৃথিবীতে নেই। সিংহ, বাঘ, গণ্ডার, হাতী, সব জানোয়ারই গরিলাকে যমের মত ভয় করে।

ঠিক হল এবার আমরা গরিলা শিকার ক'রবো। কিন্তু

গরিলা এ অঞ্চলে থাকে না। আমরা ইউগ্যাণ্ডায় দিন কয়েক বিশ্রাম ক'রে তারপর গরিলা শিকারে যাব।

পরামর্শ মত তখনই তাঁবু ওঠাবার জন্যে কুলীদের হুকুম দেওয়া হলো। দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই যাত্রার সব ঠিক হ'য়ে গেল। যে সাহেবটীর পায়ে আঘাত লেগেছিল, তাঁকে ডুলীতে বসিয়ে নিয়ে আমরা সদলবলে ইউগ্যাণ্ডা অভিমুখে যাত্রা করলাম।

ইউগ্যাণ্ডায় পৌঁছে দুই সপ্তাহ বিশ্রাম করলাম। তারপর সব আয়োজন ঠিক ক'রে নিয়ে আমরা গরিলা শিকারে যাত্রা ক'রলাম।

ইউগ্যাণ্ডার পশ্চিমে আলবার্ট নায়েঞ্জা নামে একটা প্রকাণ্ড হ্রদ আছে। সেই হ্রদ থেকে একটি শাখানদী বেরিয়ে বরাবর বেলজিয়ান কঙ্গোর মাঝামাঝি স্থানে কঙ্গো নদীর সঙ্গে মিশেচে। প্রকৃতপক্ষে এটি কঙ্গোরই একটি শাখা। এই নদীর দুইপাশে খুব গভীর জঙ্গল।

আফ্রিকার এই অঞ্চলে খুব বেশী বৃষ্টি প'ড়ে তাই জঙ্গল এখানে এত বেশী। এই সব জঙ্গল এত গভীর যে দিনের আলো তার মধ্যে ঢুকতে পারে মা। তাই দিন দুপুরেও তার মধ্যে অন্ধকার।

এ সব জঙ্গলে ঘাস নেই। জিরাফ জেব্রা, হরিণ, মোষ, হাতী, কোন তৃণভোজী জীবই এখানে থাকে না। সিংহ,

বাঘ, নেকড়ে আদি জন্তুও বড় একটা নেই। এ সব জঙ্গলে গরিলা, শিম্পাঞ্জি, বনমানুষ, এপ্‌ম্যান রাজত্ব ক'রে।

এই অঞ্চলই আমরা গরিলা শিকারের জন্যে মনোনীত করলাম।

আলবার্ট হ্রদে কয়েকখানি সরকারী ষ্টিমার আছে। তারই মধ্যে একটা ছোট ষ্টিমার নিয়ে আমরা প্রায় দশজন শিকারী কুড়িজন নিগ্রো কুলীকে সঙ্গে নিলাম।

একটা পুরো দিন আর পুরো রাত আমাদের ষ্টিমার নদীর ওপর দিয়ে গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলতে লাগলো।

দুই ধারেই বন। মাঝখানে এই নদী! ডেকের উপর বসে বিস্মিত চ'খে আমি প্রকৃতির এই গম্ভীর সৌন্দর্য্য দেখতে লাগলাম।

দুইদিনের দিন ভোর পাঁচটার সময় আমাদের ষ্টিমার কঙ্গো আর শাখা নদীর সংযোগ স্থলে পেঁছুলো। নদীর মাঝখান হ'তেই দুই পাশের জঙ্গলের নিবিড় নীরবতা দেখে বুঝলাম এইটিই দৈত্য-সম্রাট গরিলাদের রাজধানী।

নদীর মাঝখানে ষ্টিমারটি নোঙর ক'রে চারখানি জলী বোট নামিয়ে নিলাম। তারপর সকলে নিঃশব্দে তীরের দিকে এগুতে লাগলাম।

তীরে নেমে আমরা খুব সাবধানে চলচি, এমন সময় আমাদের নজরে প'ড়ল বেবুণের দল।

এই বেবুণ আবার চার পাঁচ রকমের। তার মধ্যে একটা জাত ভারী বদরাগী। তারা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধের উপক্রম ক'রতে লাগলো। বিপদে প'ড়ে আমরাও গুলি চালাতে বাধ্য হলাম। যখন গোটাকতক বেবুন মাটীতে পড়ে ধড়ফড় ক'রতে লাগলো তখন তারা বুঝলো যে ব্যাপার ভাল নয়। কাজেই তখন রণে ভঙ্গ দিয়ে তারা পালাতে আরম্ভ ক'রলে।

আমাদের রাইফেলের গুরুগম্ভীর ধ্বনি নিবিড় জঙ্গলের নীরবতা ভেঙে নিরীহ অধিবাসীদের শান্তিভঙ্গ ক'রে তুল্লে। চারিদিকে একটা কোলাহল আর বিশৃঙ্খলা জেগে উঠ্‌লো। গাছে গাছে শাখার নাচন আর ঝপাঝপ শব্দ হ'তে বুঝলাম যে শান্তিপূর্ণ জঙ্গলরাজ্যে একটা আকস্মিক অশান্তির সাড়া প'ড়ে গিয়েচে।

কাছাকাছি একটা প্রকাণ্ড গাছের নীচেকার ডালে ছুটি বন্‌মানুষ আপন মনে দোল্ খাচ্ছিলো। এমন সময় হঠাৎ কয়েকবার বাজের মত রাইফেলের শব্দ, বেবুণদের কোলাহল আর মানুষের কণ্ঠস্বর কাণে গেল। তারাও খুব চঞ্চল হ'য়ে প'ড়লো। তারপরে আমাদের সেই দিকে এগুতে দেখে তারা

গাছ হ'তে লাফিয়ে প'ড়ে গুটি গুটি সে স্থান ত্যাগ ক'রছিল। দূর হ'তে তাদের চলন দেখে আমার হাসি পেয়ে গেল। খর্ব্বকায় মানুষের মত দুই পায়ে কেমন গুটি গুটি হাঁটচে। নাদুস নুদুস ভুঁড়ীটি কেমন এগিয়ে চ'লেচে। তার উপর তাদের গম্ভীর মুখে কি মিটি মিটি চাউনি! যেন তারা নিরীহ, নিপাট ভাল মানুষ, জগতের কোন খবরই রাখে না। তাদের দেখলে মানুষ নয় বলে কার সাধ্য?

সাহেব বল্লেন "ওহে! আমাদের পূর্ব্বপুরুষ দুজন রাগ ক'রে চলে যাচ্চেন। এসো তাঁদের সঙ্গে আলাপ করা যাক।" এই বলেই তিনি রাইফেল তুলে ধ'রলেন। আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে বনমানুষ দুটো অতি করুণ আর্ত্তনাদ করে উঠলো। ঠিক যেন মানুষের চিৎকার। তারপর মাটীতে প'ড়ে কি তাদের ছটফটানি! আমার মনে ভারী কষ্ট হ'লো। আহা! মিছামিছি এ দুটি নিরীহ জীবকে মেরে কি হ'লো?

মনটা ভারী খারাপ হ'য়ে গেল। এতদিন শিকার ক'রচি, অসংখ্য জন্তু জানোয়ার মেরেচি। কিন্তু এ রকম মন খারাপ কখনও হয়নি। যা'হোক আবার আমরা এগিয়ে যেতে লাগলাম।

কিছু পরেই হঠাৎ একটা গাছের ডাল নীচু হ'য়ে এল আর সেই ডাল ধ'রে ঝুলে, দৈত্যের মত একটা ভয়ঙ্কর আকৃতির

জীব আমাদের স্বমুখে এসে দাঁড়ালো। তাকে দেখেই আমাদের চক্ষু স্থির। মাটী হ'তে পুরো চার হাত লম্বা, মিশকালো রঙের চেহারা, হৃষ্টপুষ্ট বিশাল শরীর, প্রকাণ্ড লম্বা লম্বা গরাণের খুঁটির মত দুই হাত দেখেই আমাদের হাত পা সব যেন অসাড় হ'য়ে গেল।

স্বন্দর বনে পাকুড় গাছের ডালে ব'সে, অনেক দণ্ড ধ'রে, বাঘের হিংস্র ভাব চ'খে দেখেচি। আসামের জঙ্গলে বাঘ আর ভাল্লুকের কি বিকট মুখভঙ্গী না দেখেচি। তারপর এই আফ্রিকার জঙ্গলে দুটি যুদ্ধরত সিংহের বিভীষিকামাখা মুখ ও চ'খে পড়েচে, কিন্তু আজ যে ভয়ঙ্কর মুখখানা দেখলাম তার কাছে সে সব কিছুই নয়। এর সারা মুখে যেন দানব আর রাক্ষসের সবটুকু জিঘাংসা মাখানো রয়েচে। কি ভীষণ এর দাঁত খিচুনী! কি ভীষণ ভ্রুকুটি এর কপালে! এর দুটো চোখ যেন আগুণের ভাঁটা আর তা থেকে বিদ্যুতের তেজ ছুটে বেরুচ্চে। জঙ্গলের দৈত্য সম্রাটের মত সে যেন আমাদের অনধিকার প্রবেশের কৈফিয়ৎ চাইবার জন্যে এমন রুদ্রভাবে আমাদের স্বমুখে এসে দাঁড়ালো।

হঠাৎ খুব ভয় পেয়ে গেলেও নিমেষে আমরা নিজেদের সামলে নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সকলেই সেটাকে গুলি করবার জন্যে রাইফেল তুল্লাম। কিন্তু কি ভয়ানক

যে গরিলার ক্ষিপ্রকারিতা তা ভাষায় ব'লে বোঝানো যায় না।

আমরা রাইফেল তুলে লক্ষ্য ঠিক ক'রে, গুলি ছোঁড়বার আগেই সে প্রায় দেড়শো হাত ব্যবধান অতিক্রম ক'রে আমাদের উপর এসে প'ড়লো। আমরা পাঁচ ছয় জনে গুলি ছুঁড়েছিলাম। সেটা ছুটে আসতে আসতেই তার মধ্যে দু তিনটে গুলি তার গায়ে বিঁধেছিলো কিন্তু একটা ছাড়া আর কোনটাই তেমন সাংঘাতিক স্থানে লাগেনি।

তিনটি গুলি উপেক্ষা ক'রেও সে রাক্ষসের মত আমাদের দলে এসে প'ড়লো আর সঙ্গে সঙ্গে দুই থাপড়ে দুজন শিকারীর নাড়িভূঁড়ী বার ক'রে দিলে। আরও দুজনকে সে আক্রমণ ক'রতেই আমরা আবার গুলি ছুঁড়লাম। গুলি তার মাথায় গিয়ে বিঁধলো। ভীষণ আর্ত্তনাদ ক'রতে ক'রতে মাটীতে পড়বার আগেই সে আরও দুজন শিকারীকে সাংঘাতিক ভাবে জখম ক'রে ফেল্লে। তারপর মাটীতে প'ড়ে ছট্‌ফট্ করতে করতেও একটা রাইফেলের নল চিবিয়ে চেপ্টা পাত করে ফেল্লে।

কুলীগুলো প্রাণ ভয়ে দূরে পালিয়েছিলো। সেটা ম'রতে তবে তারা ফিরে এল।

আহত সাহেব শিকারী দুটি ততক্ষণে মারা গেলেন। চারজন

শিকারীকে হারিয়ে আমরা উদ্যম ভঙ্গ হ'য়ে পড়লাম। বাপরে! এর নাম গরিলা শিকার! এতগুলো শিকারী মিলে একটা গরিলা মারতে গিয়ে যখন এই বিপদ, তখন এক সঙ্গে চার পাঁচটা গরিলা থাকলে তো রক্ষা ছিলো না?

সাহেব বল্লেন শিকার বন্ধ করা যাক্। মৃত শিকারীদের দেহ প'চবার আগে তাঁদের ইউগ্যাণ্ডায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে! এখানে আর বিলম্ব করা মোটেই চ'লবে না।"

তারপর আমরা ইউগ্যাণ্ডায় ফিরে এলাম। শিকারী সাহেবদের কবর দেওয়া হ'ল। এবং তখনকার মত আমরা শিকার ত্যাগ করলাম।

সাহেবের ছুটী ফুরিয়ে গেল। তিনি আফ্রিকার দক্ষিণ অঞ্চলে সার্ভে অর্থাৎ জরীপ কাজে লেগে গেলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে চ'ল্‌লাম। এই কয় বৎসর আফ্রিকা, মেসোপটেমিয়া, আরও দুই এক স্থানে কাজ ক'রে বেড়িয়েচি। দীর্ঘকাল পরে এক বৎসরের ছুটী নিয়ে দেশে এসেচি তাই তোমরাও আমার সেই সব দুঃসাহসের কথা শুনতে পারলে।"

ঝণ্টুদার কাহিনী শেষ হ'লেই আমরা তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে ব'ল্লাম—"আশীর্ব্বাদ করো ঝণ্টুদা! আমরা যেন তোমারই মত সাহসী হ'তে পারি।

সমাপ্ত